তোমার শক্তি কতটুকু! কোন্ সাহস, কোন্ শক্তিতে তুমি পতিপ্রাণা সাধ্বীর হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য স্বামীর স্মৃতি অপসারিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলে! রমণী প্রেমের যে নিগড়ে একবার আবদ্ধ হয়, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার মানুষের কি সাধ্য!"

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ মণিমোহন ভূপতিতা কোহিনুরের মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, ওঠ! আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি।—তুমি মৃত হয়ে নূতন প্রাণ পেয়েছিলে, তাই আমি তোমায় নূতন করে সংসারী করেছিলাম। তোমার সে-জীবনের সঙ্গে এ-জীবনের কোনই সংস্রব নাই। সে-জীবনের এক ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া তুমি তার সঙ্গে আর কোন প্রকারে সংযুক্ত নও। মা, তুমি আমার সাধ্বী কোহিনুর, চিরদিনই তুমি সতী সাধ্বী।" কোহিনুর কোন কথার উত্তর দিল না বা মুখ তুলিয়া চাহিল না; একই ভাবে পড়িয়া রহিল। তখন রোরুদ্যমান শিশুটীকে আনিয়া সরোজা কোহিনুরের বক্ষের কাছে শুয়াইয়া দিলেন; কোহিনুর একবারমাত্র হাত উঠাইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে কাছ হইতে সরাইয়া দিয়া, তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। আজ স্নেহের সন্তানের করুণ ক্রন্দন মাতৃ-হৃদয়ে অভিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই সন্তান—এ যে আজ কোহিনুরের দারুণ লজ্জা! অনন্ত কৃতঘ্নতার ছবি!!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; ধাত্রীর ক্রোড়েই শিশু আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইল। সরোজা ও মণিমোহন কোহিনুরকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টায় শিয়রে বসিয়া রহিলেন। কোহিনুর আর মুখ তুলিল না, বা একটি প্রশ্নও করিল না বা একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। আজ তাহার অন্তরে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশের আর তাহার ভাষা নাই! তাহার এখন একমাত্র বাসনা—তাহার এই জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা এইখানেই পতিত হউক।—সে আর মানুষের সংশ্রবে যাইতে চাহে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

নিবেদন

অনেক ঘুরিয়া এসেছি ছুটিয়া
বিশ্রাম লভিব বলে,
পতিত-পাবন, ওহে নারায়ণ,
স্থান দাও পদতলে!
বড়ই যাতনা—সহিতে পারি না,
হৃদয়ে ধরে না আর!

অনাথের গতি, তুমি জগপতি
করুণার পারাবার!
আঁধার হৃদয়ে তুমিই আশ্রয়
অবলার তুমি গতি,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া
ভরি দাও লক্ষ্মীপতি!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

হতাশে।

বীণায় ধরিয়াছিনু বেহাগের সুর
সযতনে নিভৃতে বসিয়া,
সাধের বীণার তার ছিঁড়িল সহসা,
দেখিলাম বারেক চাহিয়া!

উষার শিশির-মাখা ফুলগুলি ল'য়ে
বড় সাধে গেঁথেছিনু হায়,
গলায় হ'ল না পরা, রবির কিরণে
শুকাইল মালিকা আমার!

পূজার আরতি তরে দীপ হাতে লয়ে
দাঁড়াইয়া ছিলাম অঙ্গনে,
বাতাসে নিবিয়া গেল আলোক আমার,
অশ্রু-জল ঝরিল নয়নে!

দেখিতেছিলাম আমি নিশার স্বপনে
ধরা সাথে স্বরগ-মিলন,
সহসা প্রভাতরাণী আসিয়া জগতে
ভেঙে দিল সাধের স্বপন!

হিরণ-কিরণ-মাখা মণিময় হার
পরেছিনু আদরে গলায়,
বিবাক্ত সাপিনী হয়ে সেই হারগাছি
একদিন দংশিল আমায়!

যাহা ধরি, তাই যেন ছাই হয়ে যায়!—
আমি বুঝি নহি এ ধরার!
তাই যদি সত্য হয়, তবে কেন হায়,
প্রাণে এত জাগে হাহাকার!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

প্রলোভন।

হেরি' ঝরণার বারি যাই যদি মিটাতে পিয়াস
কে তুলিয়া দেয় মোরে হৈম-পাত্রে নীর
সুবাসিত!
ঘুচাতে মনের জ্বালা স্মরি যদি মলয়ের আশ,
কে আসি' ব্যজন করে ক'রে তার কঙ্কণকণিত!
বুকের আঁধার স'য়ে চাহি যদি হাসি জ্যোছনার
দেখায়ে দীপের মালা কে ধাঁধায় আমার নয়ন!
শান্ত কুটীরের কোলে নিবারিতে যাই শ্রমভার,
কে রচে সম্মুখে মম হর্ম্ম্য এক চিত্র-দরশন!

পিকের সঙ্গীতে যাই কোলাহল থামাতে হিয়ার,
কে গাহে মধুর কণ্ঠে এস্রাজের সুর মিশাইয়া!
প্রকৃতির পূত অঙ্গ যদি যায় সাধ হেরিবার,
কারুর কৈতবলীলা কে দেখায় তখনি আসিয়া!
কেবল দুখের মূল জানি' নাথ! সবে পরিহরি'
তোমার চরণ-প্রান্ত খুঁজি যবে শান্তি-কামনায়,
ঐশ্বর্য্য-সম্ভার আনি' নয়ন-উপরি মোর ধরি'
কে আবার নিমজ্জিত করি' দেয় ভোগ-লালসায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল্।

"পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্মবিসর্জ্জন চির আত্মদান।
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা ব'য় দু'নয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান!"

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উনবিংশ-শতাব্দী দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পাদে পদার্পণ করিয়াছে; রুশিয়ার দক্ষিণে ক্রিমিয়া-প্রদেশে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এক পক্ষে রুশিয়া, অপর পক্ষে তুরস্কের সুলতান, ফরাসী ও ইংরাজ। দুর্ব্বল তুরস্ককে ক্ষমতা-লোলুপ রাজ্য-পিপাসু জারের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ আজ সুলতানের পার্শ্বে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। রুশিয়া আজ তুরস্ককে তাহার স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত করিয়া অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া, স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ ন্যায়ের ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় মস্তকে বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছে।

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। রুশিয়া-দেশে দুরন্ত শীত আরম্ভ হইয়াছে। তুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর-প্রদেশ হইতে হিমবাত প্রবাহিত হইয়া যুদ্ধক্লিষ্ট সৈনিকগণকে প্রপীড়িত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্যাপ্লাবিত শিবির-মধ্যে একফুট পরিমিত জল দাঁড়াইয়াছে। সৈন্যগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এমন সময়ে আবার ক্রিমিয়ার দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইল। দেখিতে না দেখিতে সাগর-বক্ষ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে ভীমবেগে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল। অর্ণবপোতসমূহ আত্মরক্ষার বৃথা প্রয়াস পাইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইল। তীরভূমিতে সন্নিবেশিত শিবিরসমূহ প্রমত্ত প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিসাৎ হইল। ইংলণ্ড হইতে যে-সকল জাহাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিকগণের আহার-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়া আনন্দভরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আগমন করিতেছিল, দৈব-বিড়ম্বনায় তাহারা এই কালান্তক ঝড়ে বিনষ্ট হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক-পুরুষগণের অবর্ণনীয়, অননুমেয় ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি উপস্থিত হইল। যুদ্ধশ্রমাবসন্ন যোদ্ধৃবৃন্দ উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে অপক্ক অন্ন আহার করিয়া, কখনও বা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিল। হিমক্লিষ্ট কম্পিত কলেবর জীর্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারা অতিকষ্টে অর্দ্ধমৃতবৎ জীবন-ধারণ করিতে লাগিল; আর্দ্র ভূমিশয্যায় শ্রান্তক্লান্ত দেহ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিল; তথাপি জাতীয় গৌরব ও মর্য্যাদা-রক্ষার্থ তাহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় অম্লান-বদনে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হয়। অনশন-ক্লিষ্ট শ্রমকাতর শীতার্ত্ত সৈন্য-গণ অচিরে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শত শত রুগ্ন সৈনিক হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ, পরিমিত বস্ত্র, পথ্য

ও নিয়মিত শুশ্রূষার অভাবে বহু বীরপুরুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে যে, এই যুদ্ধে কেবলমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে হাস-পাতালের ১৮০৫৮ জন লোক প্রাণত্যাগ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা নিহত হয়, তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প—মাত্র ১৫৯৮ জন। হাস-পাতালের অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয় ছিল, ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অতিশয় অল্পসংখ্যক কয়েক-জনমাত্র শুশ্রূষাকারিণী ছিল। পীড়িত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে একজন অপরের সহায়তা করিত। ঔষধ-পত্র ও অস্ত্রাদির অভাবে চিকিৎসকগণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহেরও কোনরূপ সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। সর্ব্ব-ত্রই একটা বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই একটা দারুণ অশান্তি বিরাজ করিতেছিল।

এই সকল হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া পরদুঃখকাতরা, স্নেহ-প্রবণা কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-নাম্নী * এক মহাপ্রাণা মহিলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি হতভাগ্য পীড়িত সৈন্যগণের ক্লেশলাঘবে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসচিবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক এই সময়ে যুদ্ধসচিবও অনন্যোপায় হইয়া আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূ-ষার ভার গ্রহণের জন্য কুমারী ফ্লোরেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। সুতরাং উভয়ে উভয়ের পত্র পাইয়া বার পর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দেশবাসী সকলে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মহাপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা

[* স্বদেশ-প্রেমিকা এই রমণী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত লিহার্ষ্ট ও হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্গত এম্‌রে পার্কের ভূম্যধিকারী উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেলের সন্তানরূপে ইটালির ফ্লোরেন্স নগরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতাপিতার মধ্যমা কন্যা। ফ্লোরেন্স-নগরে ইঁহার জন্ম হওয়ায় ঐ নগরের নামানুসারে ইহারও নাম ফ্লোরেন্স রাখা হয়। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানেই ইঁহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শৈশবকাল হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রকৃতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রীতির ভাব দেখা যাইত। তাঁহার ক্রীড়াকৌতুক ও বৈচিত্র্যময় ছিল, এবং সেই বাল্য-বয়সেই তিনি তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকাগুলির শুশ্রূষা করিতেন ও তাহাদিগের আহত স্থানে বন্ধনী বাঁধিয়া দিতে বার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে বিধাতার যে কার্য্যের ভার লইতে হইবে, স্বয়ং বিধাতৃ-পুরুষ যেন শৈশব হইতেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্য শিক্ষা দিতেছিলেন। কথিত আছে একটী দরিদ্র মেষপালকের একটী কুকুর সর্ব্বপ্রথম রোগিরূপে কুমারীর শুশ্রূষা লাভ করে। জীবজন্তু হইতে ক্রমে তিনি আর্ত্ত মানবদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং যেস্থানে দুঃখ, ক্লেশ ও রোগের যাতনা, সেই স্থানেই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজ করিত। মানব-সেবায় আপনার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করাই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশে জন্ম-গ্রহণ করিলেও পিতার অধিকারভুক্ত প্রদেশের নিকট-বর্ত্তী বিদ্যালয়, রোগি-নিবাস, সংশোধনাগার ও অন্যান্য জনসেবার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকলাপ তিনি মনো-নিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বিদেশীয় বহু রোগি-নিবাসাদিও পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং ইংলণ্ডকে সেবা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনাকে এই কার্য্যের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এতদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে পরে বর্ণিত হইয়াছে।]

করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত কার্য্যভার এতদিনে অর্পিত হইল। অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণের ম্লানদৃশ্য অপসারিত হইবে।" নাইটিংগেল দুর্ব্বলা নারী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে অপরিসীম সাহস ও বল ছিল। সঙ্কল্প-সাধনে তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা- ও তেজস্বিতা-সন্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইত।

হাসপাতাল-সংক্রান্ত কার্য্য-পরিচালনে নাইটিংগেলের অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা নারী ছিলেন। যৌবনের প্রথম-ভাগেই তিনি তাঁহার প্রতিবেশিনী বালিকাদিগকে বাইবেল-শিক্ষাদানের জন্য একটি 'ক্লাশ' খুলিয়াছিলেন এবং শিশুচিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহার কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের অনেক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইংলণ্ডের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী সুশিক্ষিতা নারীর যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই অভাব দূর করিয়া হাঁসপাতালের দুর্দ্দশা-মোচনের চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল।

তখন জর্ম্মণীতে শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয় ছিল। তিনি এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, শুশ্রূষা-সম্বন্ধে তিনি মনে মনে যে-সকল ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা এখানে কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুতরাং তিনিও নিজে: এই স্থানে রোগীর শুশ্রূষা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রীশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ছয়মাস এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই শিক্ষা তাঁহার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। এই স্থান হইতে তিনি ফ্রান্সের প্যারিস্-সহরেও সেবার বিবিধ বিধি ও রোগি নিবাস-পরিচালনা শিক্ষা করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। এক-বৎসর বিশ্রামের পর তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং স্বকীয় কার্য্যক্ষেত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি আর্ত্ত-রক্ষিকা-সেবাসদনের (Convalescent Home for Governesses *) প্রতিষ্ঠা করিলেন ও রোগীর সেবায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দুইবৎসরের মধ্যে এই নূতন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিল। তাহার প্রথম চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি বাধ্য হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি যে দেবকার্য্য সাধন করিয়া বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ শে অক্টোবর ৩৪ (কাহারও মতে ৩৭, কাহারো কাহারো

---

* এক্ষণে ইহার নাম—"Home for Gentlewomen during temporary Illness" অর্থাৎ ভদ্র-মহিলাদিগের সাময়িক রোগ-চিকিৎসা-ভবন।

বা মতে ৪২) জন শুশ্রূষানিপুণা সঙ্গিনী সমভিব্যহারে নাইটিংগেল মহান্ কঠোর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া ৫ই নবেম্বর স্কুটরিতে আসিয়া অবতরণ করিলেন। দেবগণের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল। এই শুশ্রূষু রমণীদিগের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাসেবিকা; অবশিষ্ট রোগিনিবাসের শিক্ষিতা বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। এই শুশ্রূষাকারিণীদিগের মধ্যে অনেকে সামাজিক পদমর্য্যাদায় ও সৌভাগ্য-সম্পদে গৌরবান্বিতা ছিলেন।

স্কুটারী-নগরটী তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টাটিনোপলের অনতিদূরে বসফোরাস্ প্রণালীর অপরতীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটি বড় হাসপাতাল ছিল। যুদ্ধকালে আহত ইংরাজ সৈনিকের আবাসরূপে তুরস্কগবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ইহা ব্যবহৃত হইতেছিল। হাঁসপাতালে প্রবেশ করিয়াই নাইটিংগেল এক লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা! আহত সৈনিকপুরুষেরা রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে! সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। কেহ বা জরাক্রান্ত, কেহ বা আমাশয়-রোগে শয্যাশায়ী, কেহ বা যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত। রুগ্নব্যক্তিগণের শয্যা ধূলায় মলিন, বহুদিন যাবৎ তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে না। গৃহের দরজা-জানালার সুবন্দোবস্ত নাই, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের পথ রুদ্ধ। সৈন্যগণ দিন দিন ক্ষীণ ও ম্লান হইতেছে। রোগীদিগের উপযুক্ত পথ্যের পর্য্যন্ত সংস্থান নাই। মৃত্যু-বিভীষিকা সকলের ম্লান মুখচ্ছবিতে যেন প্রতিভাত হইতেছে।

যাহারা স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, জাতীয় সম্মান ও দুর্ব্বলের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে বিদেশে ভীষণ রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, অবশেষে তাহারাই আজ বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় মৃত্যুদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে! এই শোকাবহ-দৃশ্য-দর্শনে নাইটিংগেল একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার পাত্রী ছিলেন না; তাই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় সঙ্গিনীগণকে লইয়া তিনি উৎসাহভরে শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। একদল রুগ্ন-ব্যক্তিগণের গৃহ ও শয্যা পরিষ্কার করিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, অপরদল লইয়া নাইটিংগেল স্বয়ং রন্ধনশালায় গমন করিলেন। পরম যত্নে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহারা রুগ্নসৈনিকগণকে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। তাঁহারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবায় প্রাণমন সঁপিয়া দিলেন।

রোগীর সেবায় মানুষ ইহার পূর্ব্বে কখনও এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে কি-না সন্দেহ। রুগ্নব্যক্তিগণের রোগযন্ত্রণা-লাঘবের উপায়-উদ্ভাবন-চিন্তায় কুমারী ফ্লোরেন্স তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও তিনি অঙ্গব্যবচ্ছেদ-ভীত রোগীর পার্শ্বে অভয় দিতেছেন, সৈনিক-পুরুষগণের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাদের জন্য পত্র লিখিয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহাদের পারিবারিক অবস্থা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার সহানু-

ভক্তিসূচক প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাহারাও সরল অন্তঃকরণে সুখদুঃখের করুণ কাহিনী তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছে। সৈনিক-দের পরিবারের কোনওরূপ অর্থক্লেশ না ঘটে, এই উদ্দেশ্য দূরীকরণের জন্য তিনি সময় মত সৈনিকপুরুষগণের বেতন তাহাদের স্ত্রীপুত্রের নামে প্রেরণ করিতেন। রুগ্ন ব্যক্তিগণের প্রফুল্লতা-সম্পাদনের জন্য তিনি নানাপ্রকার সুপাঠ্য-পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার স্থাপিত করেন এবং তাহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার প্রীতিপ্রদ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন।

রোগীর সেবায় নাইটিংগেল অপরিসীম বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন; ইহাতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইত না। শীঘ্রই তাঁহাকে দশ সহস্র সৈনিকের সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং বৃস্কুতারের রোগিনিবাস-সমূহের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল। এমন কি এই সময় উপর্যুপরি ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্তও তিনি এই কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। হাসপাতালের কর্ম্মচারিবৃন্দ সর্ব্বদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন, যখন হাসপাতাল গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, নীরব ও নিস্তব্ধ, সেই নিশীথ সময়ে নাইটিংগেল স্নেহবৎসলা ও উদ্বিগ্না জননীর ন্যায় প্রদীপহস্তে একাকিনী কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ধীরপাদবিক্ষেপে গমন করিয়া রোগীদের অবস্থা নিজচক্ষে অবলোকন করিতেন। রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত অর্দ্ধনিদ্রামগ্ন সৈন্যগণ যেন স্বর্গরাজ্যে দেববালার হস্ত-সংস্পর্শে ক্ষণেকের তরে রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া এক অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিত। কেহ বা সেই মূর্ত্তিমতী দয়ার ছায়া-সংস্পর্শে মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গীয় বিমল সুখসাগরে নিমগ্ন হইত। তাঁহার এই সেবার সুব্যবস্থার ফলে রোগীদিগের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৪২ হইতে শতকরা মাত্র ২ জনে পরিণত হইয়াছিল। কুমারীর কি প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এই দারুণ পরিশ্রমে একবার তিনি স্বয়ং জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি সৈন্যদিগকে তথায় ফেলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সৈনিকগণ যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তিনি সেই সময়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেলের এই অতিমানুষিক সেবাপরায়ণতা ইংলণ্ডের দরিদ্র পর্ণকুটীর-বাসী হইতে তথাকার সম্রাটের হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। ফ্লোরেন্সকে একখানি যুদ্ধের জাহাজে করিয়া স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইয়াছিল, এবং লণ্ডন-নগরী তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজনও করিতেছিল। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, এবং সেই প্রেমেরই বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারা যশ চাহেন্ না, সম্মান চাহেন না, নিজের কীর্ত্তি-ঢক্কা নিনাদিত করিতে চাহেন্ না;—চাহেন কর্ম্মান্তে নীরবতা। এই জন্য কুমারী নাইটিঙ্গেল যেই তাঁহার জন্য ঐ মহৎ আয়োজনের বার্ত্তা শুনিলেন, অমনি তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, সকলে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা জানিবার অগ্রেই, নীরবে একখানি ফরাসী-পোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন

করিলেন এবং লোকচক্ষুর অগোচরে স্বীয় গ্রাম্য আবাসে প্রস্থান করিলেন। দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার পরবর্ত্তি-কালের নীরব জীবন স্বদেশের ও স্ব-জাতির অশেষ কল্যাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। দেশবাসী তাঁহার অক্লান্ত সেবার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মানের জন্য যে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলেন, তদ্দ্বারা তিনি শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত 'নাইটিংগেল হাউস' নামে একটি শিক্ষালয় ও কয়েকটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য সংস্কার, সৈনিক-রোগিনিবাস, সৈনিক-চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়েও তিনি গভীর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেবা-সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইংলণ্ডে দলে দলে লোক সেবা-বিজ্ঞান জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার মতে সেবার অর্থ—রোগীর জীবনীশক্তির বিন্দুমাত্র নষ্ট না করিয়া, তাহাকে নির্ম্মল বায়ু, আলোক, উপযুক্ত উষ্ণতা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির মধ্যে রক্ষা করা এবং তাহাকে সুবিবেচিত পথ্য প্রদান করা।

কুমারী নাইটিংগেল দেশের স্বাস্থ্য-বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তখন কি স্বদেশে কি বিদেশে, রোগিনিবাস-স্থাপনের কথা হইলেই তাঁহার কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মল বায়ু-চলাচল, জলনিঃসরণ, রোগবীজ-নাশের উপায়, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে কুটিরবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 'কাউণ্টি কাউন্সিল টেক্নিক্যাল ইনষ্ট্রাকশন কমিটি'-নামে এক সভার সাহায্যে তিনি চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন্। শুনা যায়, তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের অবগতির নিমিত্ত তিনি ক্রিমির সমরে সৈন্যদিগের চিকিৎসার্থ প্রেরিত ব্যক্তিদিগের কার্য্য-সম্বন্ধে একটী গুপ্ত বিবরণীও প্রস্তুত করিয়া দেন। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সংগ্রাম এবং ফরাসীদিগের সহিত জর্ম্মনদিগের যুদ্ধেও তিনি প্রভূত সৎপরামর্শ দান করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড তাঁহাকে 'order of merit' উপাধি দান করেন। অবশেষে সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের অন্তে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী রমণী ইহলীলা সংবরণ করেন।

নাইটিংগেল পরার্থপরতার যে সমুজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান জগতে দুর্ল্লভ। তাঁহার পুণ্যপূত স্মৃতিকাহিনী চিরদিন মানব-হৃদয়ে ভক্তি, বিস্ময় ও আনন্দের উৎসস্বরূপ বিরাজিত থাকিবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমে, তাঁহার সেবাধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্বার্থ-চিন্তারত, অনুন্নত জগৎকে যে সমুন্নত করিয়া তুলিবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

শ্রীমতী সুনীতিবালা চন্দ।

আলোর ধারা।

(ভৈরবী)

আহা! এই আলোকের ধারা নে তোর
বুক ভরে—বুক্ ভরে—বুক্ ভরে!
হৃদয়-কলস শূন্য করে, সুধা
রাখ্ ধরে—রাখ্ ধরে—রাখ্ ধরে!
আলোয় আলোয় ভরুক্ হৃদয়,
যেন কালো কোথাও একটু না রয়,
আনন্দেরি দেব্‌তা জাগুন্
রূপ ধরে—রূপ ধরে—রূপ ধরে!
কুসুম ফুটুক্ প্রাণে আমার,
তাঁর চরণে ঢালি এবার,
সকল বেসুর ডুবায়ে দি'
তাঁর সুরে—তাঁর সুরে—তাঁর সুরে!
ধন্য হউক্ সকল দিশি
সুন্দরে ঐ যাউক্ মিশি,
অরূপেরি রূপ হেরি এই
চার ধারে—চার ধারে—চার ধারে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ব্রহ্মার মূর্ত্তিপরিচয়।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি কবে গড়া আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। গান্ধার-ভাস্কর্য্যেই বোধ হয়, তাঁহার প্রথম মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া যে পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি গড়া হয় নাই, কিংবা তাঁহার ছবি আঁকা হয় নাই, এ কথা হলফ্ করিয়া বলা যায় না। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, গান্ধারের মূর্ত্তিসকল প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন।

সচরাচর যে সকল ব্রহ্মার মূর্ত্তি দেখা যায় অথবা ধ্যান হইতে যে মূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়—তিনি চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট, দ্বিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ, রক্ত অথবা রক্তগৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং তাঁহার হস্তে অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, স্রুক্ ও স্রুব-নামক দুই প্রকার যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ থাকে এবং তিনি হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ হংসই তাঁহার "বাহন"। মোটামুটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি এইরূপ। তাহা ছাড়া এই মূর্ত্তির নানাপ্রকার ভেদ আছে। এখন সে-সব লইয়া কাজ নাই। কেন যে ব্রহ্মার চারিমুখ হইল, কেন যে তাঁহার হংসবাহন হইল, কেন তাঁহার হস্তে অক্ষমালা, স্রুক্, স্রুব, ইত্যাদি দেওয়া হইল, তিনি কমলাসনাসীন কেন হইলেন তাঁহার একটা উত্তর দেওয়া চাই। উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ দেন নাই, আমিও যাহা দিব তাহাও যে অভ্রান্ত সত্য, তাহাও বলিতে পারি না; কেন না, সমস্তই প্রায় অনুমান-মূলক।

প্রথমেই তাহা হইলে ধরা যাউক্, ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল? তাহার উত্তরে পাঠকপাঠিকাবৃন্দকে আমি বিশ্বকর্ম্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিব। সেখানে দেখিবেন ঋগ্বৈদিক যুগে তিনি সর্ব্বদর্শী ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুখ, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি ছিল অথবা এইরূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক তিনি কল্পিত হইয়াছিলেন। এখনকার ছোটছেলেরা যে-ভাবে চিন্তা করে, সেইরূপেই ঋষিগণ ভাবিয়াছিলেন:—যিনি সর্ব্বদর্শী হইবেন, যিনি সৃষ্টি করিবেন, ক্ষুদ্রমানবের ন্যায় দুইচক্ষু

লইয়া তাঁহার কি হইবে !! যতক্ষণ তিনি সম্মুখে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, পিছনে ফিরিলে সম্মুখে দেখিতে পাইবেন না। অতএব ঋষিরা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, 'অত হাঙ্গামে কাজ কি ? চারিদিকেই চোখ, মুখ, হাত, পা দেওয়া যাউক্, সব গোল মিটিয়া যাইবে।' যে-সকল দেবতাকে মিলাইয়া ব্রহ্মা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা একটি। অতএব বিশ্বকর্ম্মার অবয়বগুলিও ব্রহ্মা পাইয়াছেন। এই ত গেল আমাদের কথা।

কিন্তু পুরাণকারেরা চারিমুখ হইবার অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহারই দুই-একটা নমুনা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কারণ, নির্ম্মল হাস্য জগতে দুর্লভ। ইহা পড়িয়া যদি একটু হাসি পায় তাহা হইলেও ভাল।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায়, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তাঁহার কাজ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি (একা পারিবেন না বলিয়া) দশজন মানস ও দশজন অঙ্গজ প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। শেষ অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা। তাঁহার নানা নাম আছে, কিন্তু গায়ত্রী ও সাবিত্রী নামেই তিনি অধিক পরিচিতা। বুঝিতেই পারিতেছেন, একে ব্রহ্মার কন্যা, তাহাতে আবার প্রথম কন্যা! গায়ত্রী রূপে ভুবনমোহিনী ও গুণে অসামান্যা হইলেন। ইহাই তাঁহার কাল হইল। ব্রহ্মা তাঁহার এই অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যার প্রতি প্রথমদর্শনেই প্রণয়াসক্ত হইলেন এবং "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চিৎকার করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গায়ত্রী সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া পিতাকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ব্রহ্মার তাহাকে দেখিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায় হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। সাবিত্রী একপার্শ্বে গেলেন, সেদিকেও আর একটি মুখ হইল; এইরূপ অপর পার্শ্বেও একটি ফুটিল। গায়ত্রী তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া আকাশে উড্ডীয়মানা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! উপরের দিকে মুখ করিয়া মাথার মাঝখানে আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় পাপে তাঁহার সুদীর্ঘ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া জটাদ্বারা পঞ্চমমুখটি আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। মুখ চারিটা হইয়া গেল। এই এক গল্প।

আবার বামনপুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইবামাত্রই কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টির ইহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না দেখিয়া নারায়ণ অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হওয়ায় শিব ও ব্রহ্মার তুমুল ঝগড়া হইল। ঝগড়া করিতে করিতে ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। শিব ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রভাগ দিয়া ব্রহ্মার পাঁচটি মাথার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। ব্রহ্মার চারিটি মুখ হইল।

শিবের এই ব্রহ্মহত্যা করিবার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, তাহা না

বলিলে আখ্যায়িকা শেষ হয় না; অতএব গল্পটা শেষ করাই, বোধ হয়, বাঞ্ছনীয়। শিব যেমনি ব্রহ্মার মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইলেন, অমনি ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দিলেন।—মুণ্ডটি তাঁহার হাতে আটার মত লাগিয়া গেল। এইজন্য মহাদেবের আর একটি নাম কপালী। কত তীর্থে তিনি ভ্রমণ করিলেন, নরকপাল হাত হইতে কিছুতেই খসিল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বারাণসীধামে অসী-বরুণার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। স্নান করায় ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু শাপহেতুক নরকপাল হাত হইতে খুলিয়া পড়িল না। তৎপরে তিনি ভগবান্ কেশবের পরামর্শ অনুসারে একটি হ্রদে স্নান করিতেই ব্রহ্মার মুণ্ড হাত হইতে পড়িয়া গেল। এখনও এই স্থান কপালমোচন তীর্থ বলিয়া খ্যাত।

তাঁহার হংস-বাহন কেন হইল? ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত। আমাদের যাহা উত্তর, তাহা পূর্ব্বেই দিয়াছি। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ঋগ্বৈদিকযুগে বিশ্বকর্ম্মার ডানা ছিল। এই ডানার সাহায্যে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে, সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন। ব্রহ্মার কিন্তু ডানা নাই, বিশ্বকর্ম্মারও হাঁস নাই। বিশ্বকর্ম্মার এই ডানার বদলে ব্রহ্মাকে যে ডানাসংযুক্ত হাঁস বাহন করিয়া দেওয়া হয় নাই, ইহা ভাবিবার কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

স্রুক্ আর স্রুব যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ইহা কেন ব্রহ্মার হাতে দেওয়া হইল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ ঋত্বিক্ বা পুরোহিত। উপনিষদেও ব্রহ্মাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বলা হইয়াছে। ঋত্বিকের কাজ যজ্ঞ করা। যজ্ঞ করিতে গেলেই যজ্ঞের উপকরণ পাত্রাদির প্রয়োজন। স্রুক্ ও স্রুব যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। তাই বোধ হয় ব্রহ্মার হস্তে এই দুইটি প্রধান পাত্র দেওয়া হইয়াছে।

তিনি পদ্মযোনি কেন হইলেন এবং কেনই বা তাঁহার হাতে অক্ষমালা আসিল, তাহার একটা উত্তর দেওয়া যাউক্। পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভি হইতে একটি সনাল কমল উত্থিত হয় এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম পদ্মযোনি। উৎপত্তি হইবামাত্র ব্রহ্মা যোগ আরম্ভ করেন। অক্ষমালা সেই যোগেরই নিদর্শন।

মোটামুটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি-সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য ছিল, তাহা প্রায় সমস্ত বলা হইল। কিন্তু একই দেবতার মূর্ত্তি নানাপ্রকারের হয় কি করিয়া? আপনারা বোধ হয় জানেন, শিল্প-শাস্ত্র বলিয়া আমাদের দেশে এক প্রকার চলিত পুঁথি আছে। ইহাতে দেবতাদের মূর্ত্তি গড়িবার প্রণালী পাওয়া যায়। শিল্প-শাস্ত্র যাঁহারা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এক প্রকার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। নানাদেশের শিল্প-শাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রণালী দেওয়া আছে। শিল্পী যে প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারই বিভিন্নতায় বিভিন্ন মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের খেয়ালে মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভক্তের ইচ্ছানু-সারেও মূর্ত্তির প্রকারভেদ হইয়া থাকে। ভক্ত যে মূর্ত্তিতে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপে মূর্ত্তি গঠিত হয়।

এইরূপ-ভাবে ব্রহ্মারও মূর্ত্তিভেদ সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মার যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেগুলিকে উপস্থিত নিম্নলিখিত নয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক। সাবিত্রী, সরস্বতী, হাঁস কিংবা মুনি-ঋষি বা ভক্ত কেহ উপস্থিত থাকিবেন্ না। তিনি শুধু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন কিংবা পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

(২) তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন্ হয় শুধু আসনের উপর, নয় পদ্মের উপর; এবার একা থাকিবেন না। সাবিত্রী, সরস্বতী, হংস ও ঋষিরা সকলেই অথবা ইঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) তিনি বসিয়া থাকিবেন; বসিবেন পদ্মের উপর। তিনি একক হইবেন। সাবিত্রী সরস্বতী ইত্যাদি পরিবারদেবতা-দিগের কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

(৪) তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবার-দেবতাগণের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৫) তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকিবেন। সঙ্গে পরিবারদেবতাগণের সকলেই বা এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারে না।

(৬) তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস-কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবারদেবগণ উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

(৭) এই ব্রহ্মার নাম প্রজাপতি-ব্রহ্মা। মুখ একটি থাকিবে। বামে সাবিত্রী থাকিবেন। হাঁস একেবারেই থাকিবে না।

(৮) তিনি শুধুই ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং পদ্মাসনে আসীন থাকিবেন। অপর কোনও পরিবারদেবতা উপস্থিত থাকিবেন না।

(৯) ব্রহ্মার সঙ্গে হয় নন্দী (শিবের বাহন) থাকিবে, নয় গরুড় (বিষ্ণুর বাহন) থাকিবে, না হইলে ঘোড়া (সূর্য্যের বাহন) থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্য পরিবার-দেবতারা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, না থাকিতেও পারেন।

ইহা ছাড়া ব্রহ্মার কোন মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। যদি হয়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। যার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাবেই ইঁহার মূর্ত্তি গড়িতে পারে। কিন্তু মোটামুটি রূপটি তাঁহার বজায় রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে ব্রহ্মা বলিয়া চেনা যাইবে না।

মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ করা যায়। তাহার উপায়ও আছে। যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাণ। যেমন, ব্রহ্মার দুইহাত-ওয়ালা মূর্ত্তি চারিহাত-ওয়ালার চাইতে পুরাণ। যে ব্রহ্মার একমুখে দাড়ি তাহা আর একটু নূতন, যে-মূর্ত্তির চারিমুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। যে-মূর্ত্তিতে কারু-কার্য্য যত কম, সে মূর্ত্তি তত পুরাণ। খৃষ্টীয় দশম শতকের পর ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সব মুখেই দাড়ি আছে। এইরূপ অবয়ব দেখিয়াই সকল সময়ে মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ করা নিরাপদ নহে। যেমন, আমরা জানি গান্ধার-কারুর্য্য খুব পুরাতন। ইহাতে যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই বৌদ্ধ। ইহারই মধ্যে একটিতে ব্রহ্মার

প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখে দাড়ি আছে। তাই বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ১০ম শতাব্দীতে তোলা উচিত নহে। সময়-নিরূপণ করিতে গেলেই যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া সাবধানে কাজ করিতে হয়। তাহা না হইলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মার মন্দির-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। এটা ঠিক যে, এককালে ব্রহ্মার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল, এককালে তাঁহার পূজা-অর্চ্চনাও হইত, এককালে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার উদ্দেশ্যে বিরাটকায় মন্দিরও তৈয়ারী করিতেন। বৌদ্ধদের উপদ্রবেই হউক্ বা শিবের অভ্যুত্থানেই হউক্, তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব সমস্তই প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের গর্ভাগারে (Sanctum Sanctorium) থাকে না; এখন তাঁহার মূর্ত্তি শোভা-বৃদ্ধির জন্য মন্দিরে স্থান পায়। কখনও দেওয়ালে, কখনও দরজার পার্শ্বে, কখনও আলিসার নীচে, ছাতালে আনাচে কানাচেয় তাঁহার স্থান। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার মন্দির একেবারেই নাই? আছে। পুষ্করতীর্থে সাবিত্রী-পাহাড়ের উপর যে সাদা মন্দিরটি আছে, সেটি ব্রহ্মার। সকলেরই ধারণা,—ইহা ছাড়া ব্রহ্মার আর মন্দির ভারতবর্ষে নাই। ইহা ত ঠিক নহে। বুন্দেলখণ্ডের ছভাহি-নামক গ্রামে কানিংহাম একটি খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির পান। তারপর রাজপুতানায় বসন্তগড়-নামক স্থানে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। ধারওয়ার-জেলায় অন্ততঃ নয়টি ব্রহ্মার মন্দির আছে। সব চাইতে বড়, কারুকার্য্য-খচিত একটি মন্দির ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়ব্রহ্ম-নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এখানে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুধু ব্রহ্মারই পূজা করিয়া আসিতেছেন, অন্য দেবতার পূজা কখনও করেন না। শুধু তাহাই নহে, রূপমণ্ডল-নামক একখানি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিক শিল্পগ্রন্থে ব্রহ্মার মন্দির গড়িবার প্রণালী, আয়তন ইত্যাদি দেওয়া আছে। ব্রহ্মার পূর্ব্বগৌরবের এইগুলিই নিদর্শন। এই সকলই 'এতদিন পরেও জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হইয়া সগর্ব্বে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া তাঁহার লুপ্ত প্রভাবের কথা মানবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কে বলিতে পারে, কালের অসীম ক্ষমতাবলে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার নাম তাঁহার সৃষ্টি হইতে চির-কালের জন্য মুছিয়া যাইবে না!!

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

শারদীয়া পূজার ছুটি যখন শেষ হয়, তখন তাহা একটী স্নেহ-মধুর স্মৃতি রাখিয়া যায়। সে-স্মৃতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগ্নিপ্রদত্ত চন্দনটীকায়। সে টীকা রাজার রাজটীকা অপেক্ষা অধিক আদরের, অধিক সম্মানের, অধিক ভালবাসার জিনিষ।

এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার স্মৃতি কি করিয়া যে হৃদয়ে এত গভীর রেখা-পাত করে, তাহা ভাবিবার

বিষয়। ইহাতে উপচারের আধিক্য নাই, আড়ম্বরের প্রাধান্য নাই, মন্ত্রাদির বিশিষ্টতা নাই। একটী পান, একটী সুপারি, একটী সন্দেশ, দুটী ধান-দূর্ব্বা ও একটু চন্দন,—ইহাই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মোটামুটী উপচার। তাহার পর যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্র দেন এবং পরিপাটীপূর্ব্বক আহার করান্। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে শুদ্ধ ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া, বাম হস্তে রেকাবিতে করিয়া উপচার লইয়া ভগিনী উপস্থিত হন। তাহার পর স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাহার উপর ভ্রাতাকে উপবেশন করাইয়া বাম হস্তের অনামিকা-দ্বারা চন্দন লইয়া ভ্রাতার ললাটে চন্দনের টীকা অঙ্কিত করিয়া দেন।

ইহার মন্ত্র বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল নয়, রচনা-মাহাত্ম্যে শ্রুতিমধুর নয়, গভীর দার্শনিক-তত্ত্বে পরিপুষ্ট নয়। কবি কালিদাস রায়ের ভাষায়

'শাস্ত্র আজি তা'র রুক্ষ আঁখি তুলি
শাসন করে না-ক, ধরে না দোষগুলি,
হিয়ার অন্তরে মন্ত্র জাগে যাহা
আজিকে নহে তাহা হেয়।'

ইহার মন্ত্র সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় রচিত বাঙ্গালী ভগিনী-জীবনের অন্তরের কামনা। ইহাতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দেখিবার কিছুই নাই, ইহার গূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত গভীর গবেষণায় মত্ত হইবার কিছুই নাই। ইহাতে আছে বাঙ্গালী ভগ্নী-স্নেহের সহজ সরল অভিব্যক্তি, ইহাতে আছে প্রাণখোলা ভালবাসার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস। ইহার মন্ত্রটী তিনবার মাত্র আবৃত্তি করিতে হয়। ছত্র-কয়টি এই—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়্‌ল কাঁটা ;
যমুনা দেন যমকে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা ;
আমার ভাই যেন হয় সোণার ভাঁটা।'

এই মন্ত্রের মধ্যে হয়ত অর্থের সামঞ্জস্য নাই, রচনার পারিপাট্য নাই, ভাষার গাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু এইসকলের অভাব একমাত্র ইহার সহজ সরল ভগ্নী-হৃদয়ের ভালবাসার নিকট পরাস্ত। ইহাতে কিছুই নাই, তবুও এমন একটা জিনিষ আছে, যেটা জগতে সকলের চেয়ে দুর্লভ। ইহার মধ্য দিয়া ভগ্নী-হৃদয়ের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র সুন্দর নহে, তাহা অপেক্ষা আরও কমনীয়তর কিছু।

ভগিনী তাহার ভগিনী-জীবনের সমস্ত সাধনা ও কামনা দিয়া ভাইকে এ মর জগতে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতে চায়। যে যমুনা অনন্তকাল ধরিয়া প্রতিবর্ষে মৃত্যুরাজ যমের ললাটে চন্দন-বিন্দু দিয়া আসিতেছেন, তিনি ত' তাহারই ন্যায় ভগিনী। তাহার প্রার্থনা—ভায়ের জীবন যেন স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়, দেহ যেন জরা-রোগহীন ও সুদৃঢ় হয়। এ প্রার্থনা কত সরল, কত আন্তরিক!

'আজিকার দিনে উচ্চ-নীচ-ভেদ নাই—
ভৃত্যো বলি' দাদা আজিকে ধনী বালা
সম্মুখে ধরে পরমান্ন-ভরা থালা,
দাসীর কর হ'তে আশিস্ লভে আজি
প্রভুর পুত্রেরা সাদরে!'

আজিকার দিনে কেহ কখনও ভ্রাতার অথবা ভগ্নীর অভাব বোধ করে না। যাহার ভাই নাই, আজ বাঙ্গালার সমস্ত পুরুষ তাহার ভাই ; যাহার ভগিনী নাই, বাঙ্গালীর ঘরে সমুদায় নারী তাহার ভগিনী।—

'কাহার ভাই নাই, কে কাঁদে ধূলি-তলে,
মুছাও অঞ্চলে তাহার আঁখি-জলে।'

যাহার ভাই নাই সে পাড়ার ভ্রাতৃস্থানীয় সকলকে ফোঁটা দিয়া ভগ্নী-হৃদয়ের 'স্নেহক্ষুধা' মিটায়। যাহার বোন্ নাই সে সে-দিন স্নেহের অভাব বোধ করে না। কেহ না কেহ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ভ্রাতার আসনে বসাইয়া সানন্দে তাহার ললাটে ভ্রাতৃচিহ্ন আঁকিয়া দেয়। এ-দিন বাঙ্গালী-জীবনের শুভদিন; গুরুজনের আশীর্বাদের ন্যায় শুভ, নারী-হৃদয়ের ন্যায় পবিত্র। আজ আমাদেরও প্রার্থনা কবির সঙ্গে একতানে ধ্বনিয়া উঠুক্—

'আজিকে সাত ভাই-চম্পা সম জাগি
রহ এ বঙ্গেরে উজলি।
ভ্রাতৃ-গরবিণী পারুল ভগিনীর
উঠুক হৃদি-সুধা উছলি!'

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভায়ের ভালে গন্ধঘনে
চন্দ লিখিয়া
শঙ্খ-ঘোষে জানাও যমে
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া!
অমোঘ তব মন্ত্রে অয়ি
ভাইকে কর মৃত্যু-জয়ী!
সকল রণে অসংশয়ী
আসবে জিতিয়া!

তোমার দেওয়া বিজয়-ফোঁটা
পুণ্য প্রভাতে,—
উজ্জলিবে বিশ্বে তারে
শান্ত শোভাতে
তোমার স্বতঃ স্নেহের বাণী
শুনেন্ নিজে ত্রিশূল-পাণি,
যাঁর চরণে হে-কল্যাণি!
—শমন বিকিয়া!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গ-বধূ।

মধুর স্বপ্ন ঘোর তন্দ্রাজড়িত তরুণী-নয়নে তখনও লাগিয়া আছে; পার্শ্বে কুসুমকোরক-সম সুকুমার শিশু শায়িত। সহসা জননীর বক্ষ-আচ্ছাদন কোমল ক্ষুদ্র হস্তের তপ্তস্পর্শে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিল। সে-স্পর্শে মাতার নিদ্রা টুটিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, গবাক্ষ ভেদ করিয়া প্রত্যুষের পিঙ্গল আভা কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে; আর সেই আধ আলোক ও আধ অন্ধকারের খেলায় শিশু যোগ দিতে চাহে। তাই তাহার সেই স্নেহপিপাসু নীরব আহ্বানে তরুণী জননী শিশুর নিকট সরিয়া আসিল;—সঞ্চিত-ক্ষীরভারকুব্জ পয়োধর তনয়ের পুষ্প-পুটসম ওষ্ঠাধরের মধ্যে বিলীন হইল। তৃপ্তির মাঝে শিশুর লোচন আবার আপনা হইতেই মুদিত হইয়া গেল।

উষার আলোক-রেখা ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। মুকুর ও চিত্রপট-শ্রেণী, গৃহকোণে বিলম্বিত রৌপ্য-মণ্ডিত যষ্টি ও জলপূর্ণ ধাতু-পাত্র হইতে আলোক প্রতিফলিত হইল। লোহিত বর্ণের সিন্দুকটি আরও লোহিত দেখাল।—প্রাঙ্গণের আম্র বৃক্ষের ঘন পল্লবে দেহ আবৃত করিয়া দোয়েল অত ডাকিতেছে কেন? হোক্ না তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বর। বনবিহঙ্গের বন্দনা-গান প্রভাতের গৌরব বটে; কিন্তু সে কাকলীতে, সে কলকোলাহলে যদি খোকা জাগিয়া উঠে! চির নব চির পুরাতন অভ্যাগতের মত যে কিরণচ্ছটা কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ত' বিধাতারই আশিস্, কিন্তু শান্ত তরঙ্গসম সুখ-শয্যায় শয়ান ঘুমন্ত তনয়ের ঘুমঘোর ঐ কিরণ-স্পর্শে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে? ভাবিতে ভাবিতে তরুণী শিশুর শিথিল ওষ্ঠপুট হইতে অতিধীরে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারপর আরও ধীরে উঠিয়া ভিত্তি-গাত্রস্থিত স্বর্গগত শ্বশুরের পটের নিম্নে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। নিঃশব্দে গবাক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, আর একবার স্নেহোৎকণ্ঠ-জড়িত সতৃষ্ণ নয়নে সুপ্ত সন্তানের বদন-পানে চাহিয়া দেখিল, আলোকহীন কক্ষে শায়িত শিশুর মুখখানি নীল সরোবরের বক্ষঃস্থিত ফুল্ল কমলের ন্যায়ই ভাসিতেছে। তাহার ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠের ক্ষীণ হাস্য-আভাটুকু সেই আঁধার কক্ষে স্তিমিত দীপালোকের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষদ্বার ও গৃহপ্রাঙ্গণে মঙ্গল-বারি সেচিত হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি গোময়-লিপ্ত হইল। পরে হস্ত ধৌত করিতে করিতে জননী আর একবার উৎকর্ণ হইয়া রহিল—সন্তানের ক্রন্দন-আহ্বান শুনিবার জন্য! না, সে ত' এখন উঠিবে না, এখনি ত' তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসা হইয়াছে। গতরাত্রের ব্যবহৃত তৈজসপত্র নিপুণ হস্তের ত্বরিত মার্জ্জনে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল; দৈনিক যজ্ঞারম্ভোপযোগী কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল, আর অমনি তনয়ের আহ্বান আসিয়া পৌছিল। এই আহ্বানের জন্য মাতৃহৃদয় যেন এতক্ষণ ক্ষুধিত হইয়াছিল। বৈশাখের শেষে দিনের আলো যখন স্তব্ধ হইয়া থাকে, বাষ্পাকুলা ধরণীর পিপাসিত হৃদয় তখন এমনি আকুল উৎকণ্ঠার সহিত মেঘের ডাকের প্রতীক্ষা করে।

এতক্ষণে খোকার পিতামহী গঙ্গাস্নান, জপ-পূজা সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বধূর নিকট গোয়ালা দুগ্ধ দিয়া যায় নাই শুনিয়া প্রত্যহ যে সকল বিরক্তি-বাক্য উচ্চারণ করেন, সেগুলি যথারীতি উচ্চারণ করিয়া খোকাকে লইবার জন্য উপবেশন করিলেন। শিশু তখন তৃপ্ত। গিরিশিখর বহিয়া চঞ্চল জলধারা যেমন উপত্যকার উপলখণ্ডে আঘাত করে, মাতৃক্রোড় হইতে আসিবার সময় তেমনই মধুর হাসি হাসিয়া সে স্থূল হস্তদুটি প্রসারিত করিল। তখন নবীন-পুরাতনের অস্ফুট আলাপ আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যুগযুগান্তের প্রাচীন যামিনী-অঙ্ক আলোকিত করিয়া শিশু-তপন হাসিয়া উঠিয়াছিল; মহাকাশের বিশাল হৃদয় ভরিয়া হেম-বিদ্যুৎ-প্রভা এখনও হাসিয়া থাকে; প্রাচীন বৃক্ষ-কাণ্ড ঘেরিয়া প্রতিবর্ষেই নব পল্লব নৃত্য করে। নূতন-পুরাতনের এ আলাপন জগতের চিরন্তনী প্রথা। বৃদ্ধার ক্রোড়ে শিশুর শয়ন সেই প্রথারই প্রতিচ্ছায়ামাত্র।

আবার সংসারের দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হইল। স্নানের পর শুচিস্মিতা হইয়া বধূ গৃহদেবতা রাধাশ্যামের পূজার উপকরণ সজ্জিত করিয়া দিল। তাহার পর রন্ধনের পালা। দুইটি উনান জ্বালা হইল। শীঘ্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইবে। দেবর আহার করিয়া পড়িতে যাইবে। ক্ষিপ্র-হস্তের ঘন সঞ্চালনে শঙ্খ ও হেম বলয় শিঞ্জিনী-গুঞ্জন মুখর হইয়া উঠিতেছে। মর্ম্মরপ্রস্তর-সম মসৃণ ভালে চূর্ণকুন্তল স্বেদবিজড়িত;—রক্তিম গণ্ড অগ্নিতাপে আরও রক্তিম। তরুণী রমণী এখন অন্নপূর্ণা।

শ্বশ্রূ শিশুকে লইয়া নিকটস্থ বাটীতে গৃহোৎপন্ন কুষ্মাণ্ডের অংশ দিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া দেবর রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল;—তাহার হস্তে পত্র। সে পত্র খুলিয়া দেখার তখন সময় নাই। সময়াভাব না লজ্জার প্রাবল্য? অন্ন প্রস্তুত!—দেবরের সম্মুখে অন্নের পাত্র স্থাপন করা হইল। দেবরের আগ্রহ-অনুরোধ সত্ত্বেও পত্রাবরণ ছিন্ন হইল না। অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক যখন আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, তখন সে-পত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ অতিশয় দ্রুত হইলেও, বালক সন্তুষ্ট। দাদার কুশল-সংবাদ ও আগমনের দিনকাল জানিয়া লইয়া প্রফুল্লচিত্তে বালক যখন চলিয়া গেল, তখন পত্রখানির উপর আর একবার ব্যগ্র দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বধূ সেই সুদূরাগত বন্ধুকে সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিল। আজ শুভদিন, প্রভাতের বার্ত্তা বড়ই মধুর!

ক্রমে শ্বশ্রূর রন্ধনের আয়োজন, সন্তানের দুগ্ধ-জ্বাল, বাটীর অবশিষ্ট প্রাণী কয়টির ভোজন ও আহার-পাত্র-পরিষ্কার যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর তনয়কে স্তন্যদান করিবারে সময় বিশ্রাম। পাড়ার সমবয়সী সখীর দলের কেহ আসে নাই। বধূ তনয়কে আজ তাহার পিতামহীর নিকট রাখিয়া ছিন্ন-বসন-সংস্কার ও সন্তানের শয্যাবস্ত্র বা অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইল। তৎপরে শ্বশ্রূকে রামায়ণের কতক অংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়া বধূ যখন উঠিল, তখন অপরাহ্ন।

দেবর বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছে। তাহাকে আহার্য্য দেওয়া হইল। শ্বশ্রূর আদেশে অযত্নরক্ষিত কেশের যথোচিত সংস্কার-বিন্যাস করা হইল। তাহার পর বধূ তনয়ের সিন্দূর-চর্চ্চিত অঙ্গুলী ও মুখমণ্ডল অঞ্চলধারা মুছিয়া দিল। শিশুর এই নির্ব্বিকার উপদ্রব জননীর কেশ-প্রসাধনের প্রধান অন্তরায়, কিন্তু এই উপদ্রব না থাকিলে প্রসাধনের অর্দ্ধেক সুখ-অর্দ্ধেক মাধুর্য্য চলিয়া যায়।

এখন সন্ধ্যা। শঙ্খ-নিনাদে মণিকুন্তলা সন্ধ্যাকে অভিবাদন করিয়া তুলসী-বেদীর মূলের ক্ষুদ্র দীপটি প্রজ্বলিত করিয়া গৃহের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া বধূ রজনীর আহার্য্য প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করিল। সকলের আহার শেষ হইলে পর মন্থর-চরণে বধূ শয়নগৃহে গমন করিল। পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে তখনও পাঠরত দেবরের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। শ্বশ্রূ জপমালা তুলিয়া রাখিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি শয়ন করিলেন, পাদপ্রান্তে বসিয়া বধূ নিয়মিত কর্ত্তব্য পালন করিল। অবশেষে শ্বশ্রূর শয্যা হইতে নিদ্রিত সন্তানকে তুলিয়া সে শয়ন-গৃহে

আসিল। শিশু আপন শয্যায় ঘুমাইতে লাগিল। জননী গবাক্ষদ্বার-সমীপে দাঁড়াইল। তখন ক্ষীণ চন্দ্রকর গগন হইতে লুপ্ত হইয়াছে! ঊর্দ্ধ আকাশে তারার মেলা! দূরে কাননে খদ্যোতের নৃত্য। বৃক্ষমূলে একরাশ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া জোনাকি-বালা আলোক-বিন্দু পরিধান করিয়া লুব্ধ প্রণয়ীর সহিত লুকাচুরি খেলিতেছে। পার্শ্ব হইতে একটা ঝিল্লীর অশ্রান্ত ঝঙ্কার কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছে। আবার প্রদীপ-পার্শ্বে আসিয়া বধু প্রভাতের সেই পত্র বাহির করিল। পাঠসমাপন হইলে প্রীত নেত্র সন্তানের প্রতি ধাবিত হইল। জননী দেখিল, নিদ্রিত শিশুর হস্ত আপনা হইতেই মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতেছে। সহসা তাহার পিপাসিত অধর নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শিশু জননী-অঙ্কে স্থাপিত হইল, আর জননী-বক্ষ হইতে স্নেহ-ধারা কোমল টানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সারা বঙ্গের হৃদয় এখন নিদ্রিত। বঙ্গের জননী ও বঙ্গের আশা মুদিত পদ্মের মত ঘুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের ঘন কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল হইতে নিদ্রা আসিয়াছে। স্পর্শ-কোমল মায়াময় অঙ্গুলি বুলাইয়া তাহাদের চক্ষের চেতনা অপহরণ করিয়াছে। নীলাম্বর লক্ষ নেত্র মেলিয়া অপলক-ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। জগৎ স্তব্ধ! তাহার বিরাট হৃদয় স্পন্দনহীন। চতুর্দ্দিকে অসীম শান্তি বিরাজমান। তাহারি মাঝে পৃথিবীর সুপ্ত জীব তৃপ্তির সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। সে সন্ধান সার্থক হউক। তাহাদের নিদ্রা রজনীর নীরবতার ন্যায় গাঢ় হউক্। অগণিত তারার উৎফুল্ল হাস্যের ন্যায় তাহাদের অন্তর পবিত্র হউক্। আর যে বসন্ত-নিঃশ্বাস-সুরভিত নৈশ সমীরণের মৃদু-চঞ্চলগতি-বেগে ক্লান্ত জননীর বস্ত্রাঞ্চল কম্পিত হইতেছে, শিশুর অনিবিড় লঘু কেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই স্নিগ্ধ প্রফুল্ল সমীরণের মতই মাতাপুত্রের জীবন স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হউক্! ঐ কক্ষ বঙ্গের হৃদয়, ঐ তরুণী বঙ্গের জননী, আর ঐ শিশু বঙ্গের ভরসা।

নানা কথা।

১। চীন-দেশের কোন কোন স্থানে বিবাহের জন্য একরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাটীর বাহিরে কলসী বা ভাণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সেইগুলি বিবাহের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। কলসীর মুখ নীচের দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, বাটীর কন্যার বিবাহের বয়স হয় নাই। কলসীর মুখটা রাস্তার দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছে। কন্যার বিবাহ হইয়া গেলে কলসী তথায় আর রাখা হয় না

২। গতবর্ষের বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ, শুশ্রূষাকারিণী ও ঔষধ প্রস্তুতকারিণী মহিলা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাখা-সমূহের পক্ষে এইসকল বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছাত্রী-লাভও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কন্যাদিগের মাতা-পিতা, অভিভাবক-অভিভাবিকা অথবা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি সদ্বংশজাত কন্যাদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত করেন, তাহা

হইলে তাঁহাদের প্রভূত সাহায্য হয়। শিক্ষাবস্থায় এবং পরবর্ত্তি-কালেও ঐ সকল কন্যাদিগের মঙ্গলবিধানের জন্য কোনওরূপ ত্রুটী হইবে না।

৩। মহামারীর কবল হইতে দেশবাসী কিরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহার বিষয় তাহাদিগকে জানাইবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই নবেম্বর মাস হইতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবেন্ স্থির করিয়াছেন্। তথাকার সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টারের উপর এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত কতিপয় সাব-এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষালাভের পর, ভ্রমণশীল ঔষধাগার লইয়া জনসাধারণের নিকট ম্যাজিকলণ্ঠন দেখাইয়া উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন্ এবং মহামারী সম্বন্ধে পুস্তিকা-বিতরণ করিবেন্। ইহার জন্য আবশ্যক টাকাও গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন্।

৪। ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসিতেছেন, এজন্য এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রভূত আয়োজন হইতেছে। যুবরাজ জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দনাদি প্রদানের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন্, তাঁহারা যদি সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের হিতকল্পে সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র মোচনের অথবা তাদৃশ প্রশংসার্হ কার্য্যের চেষ্টা করেন্, তাহা হইলে তিনি অধিকতর প্রীতিলাভ করিবেন।

৫। বায়োস্কোপে যে-সমস্ত চিত্র দেখান হয়, তাহা প্রায়ই বাস্তব ঘটনার অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতির দ্বারা অভিনীত বাস্তব ঘটনার অনুরূপ ব্যাপারের। এই অভিনেতারা অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়া থাকে। মিস্ মড্লিন্ ডেভিস্ নাম্নী এক মহিলা এইরূপ একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। সম্প্রতি ইনি পূর্ণবেগে চলনশীল একখানি মোটরগাড়ী হইতে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে আরোহণ করিতেছিলেন্। এরোপ্লেন হইতে একটী দড়ির সিঁড়ি ঝুলিতেছিল; তাহা হইতে আবার একটী শুধু দড়ি ঝোলান ছিল। মহিলাটী যথাসময়ে দড়ি ধরেন্। কিন্তু এরোপ্লেনটী যেই উপরে উঠিতে থাকে, তখন হঠাৎ তাঁহার হাত ছাড়িয়া যায় এবং প্রায় ১৫ ফিট উচ্চ হইতে তিনি ভূমিতে পতিত হন্। বহু দর্শক তাঁহার এই আরোহণ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত আঘাতেই ঐ অসমসাহসিকা রমণী যমসদনের অতিথি হইয়াছেন।

৬। লণ্ডন-সহরের কতিপয় বস্ত্রবিপণিতে একটী নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। কেহ বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিলে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া সেই বস্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয়। কত গজ বস্ত্র ইহার মধ্য দিয়া যাইতেছে, তাহা ইহা দ্বারা আপনা আপনি সূচিত হইতে থাকে এবং যথাস্থানে কাটিয়া দিয়া ইহা ক্রেতাকে কত মূল্য দিতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দেয়।

৭। ব্রহ্মদেশ এতদিন ছোটলাট-বাহাদুরের শাসনাধীনে ছিল। এইবার উহাকে প্রদেশে বা "প্রভিন্সে" পরিণত করিয়া উহার জন্য গবর্ণর বা লাট-বাহাদুর নিযুক্ত হইতে চলিলেন। ব্রহ্মদেশের লাটের বার্ষিক বেতন ১,০০,০০০৲ টাকা এবং তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্যদিগের বেতন ৬০,০০০৲ ষাট হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 701. January, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০১ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৮। জানুয়ারী, ১৯২২।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

ভিখারী জগৎ।

অনন্ত বিশ্বের মাঝে
অনন্ত ভিখারী সবে,
অনন্ত প্রাণের মাঝে
যাচিছে অনন্ত রবে।
দ্বারেতে দ্বারেতে কেহ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাগে,
নীরবে হৃদয়-মাঝে
কারে খুঁজে অনুরাগে!

কাহারো মরম তৃষা
ভাষায় প্রকাশি গায়,
অব্যক্ত কাহারো তৃষা
অশ্রু-সনে ঝরে যায়।
কাহারো গোপন কথা
গোপনে শুকায়ে যায়,—
জীবন-আহুতি সনে
শ্মশানের বহ্নিপ্রায়!

শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা।

চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমরা আজকাল 'Reality Reality' (বাস্তব বাস্তব) করিয়া খুব চিৎকার করি। থিয়েটারে গিয়া বলি, "লোকটা কি Natural অভিনয় কচ্ছে!" একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলি—"বইখানা Realistic." স্বীকার করি Realism এবং Naturalness এর প্রয়োজন আছে। তবে এ-কথাও ঠিক্ যে আর্ট বলিতে বাস্তব ছাড়াও অনেকখানি বুঝায়। বস্তুতঃ, আর্ট Idealism বা আদর্শবাদের নামান্তর—আর্ট ভাবপ্রধান। দিগ্বিজয়ী জর্ম্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটে (Goethe) বলেন—"In fact Art is called Art, because it is not Nature."—অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া নহে বলিয়াই আর্টকে আর্ট

বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন, "যে কোন জীবিত মনুষ্যের সহিত আর্টের মানুষের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, জীবিত মনুষ্যটী অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী; কারণ, আর্ট প্রকৃতি অপেক্ষা সম্পূর্ণতর।" প্রকৃত-পক্ষে, চিত্র ঠিক্ স্বাভাবিক হইতেই পারে না। শিল্পীকে কিছু সংযোগ-বিয়োগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে আর্ট অস্বাভাবিকও হইতে পারে না। মানুষ আঁকিতে গিয়া কোন শিল্পী তিন-খানা হাত অথবা চারিখানা পা আঁকিতে পারে না। শিব গড়িতে বানর-গড়া শ্রেষ্ঠ শিল্পের পরিচয় নহে। কিন্তু কেহ যদি বলেন, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ এবং বর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই, তাহা হইলে ব্যাপারটা অনেকটা কংস-রাজার "বদ ফরমাইস্" এর মত হইয়া পড়ে এবং ললিতকলার পক্ষে কতকটা অবান্তর হয়। কেহই বলিতে পারে না, মানুষের কোন্ অঙ্গের স্বাভাবিক মাপ কি। কোন দু'জনের মাপ অনুরূপ নয়। 'ভিনাস্ অফ্ মাইলো' প্রাচীন গ্রীক্-ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ বিখ্যাত মূর্ত্তিটীর সহিত অনেক প্রসিদ্ধ সুন্দরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের তুলনা করা হয়;— তাহাতে দেখা যায় যে, মূর্ত্তির সঙ্গে কাহারও সমুদয় মাপ মিলে নাই। বাস্তবিক প্রয়োজন-অনুসারে শিল্পী আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতির কিছু ইতরবিশেষ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। কাব্যে আমরা ডমরু-মধ্য, পদ্মপলাশ-লোচন, আকর্ণচক্ষু, কুন্দদন্ত প্রভৃতিতে আপত্তি করি না; কিন্তু চিত্রে ঠিক্ বাস্তবটা না দেখিতে পাইলে ক্ষুব্ধ হই। ইহাকে Bias বা জেদ্ ব্যতীত আর অন্য নামে অভিহিত করা চলে না। সেক্স্পিয়ার গাহিয়াছেন,— "নিকষিত হেমকে রঞ্জিত এবং লিলিকে চিত্রিত করিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা।" কথাটা সত্য; কিন্তু প্রকৃতির তাবৎ বস্তুই কিছু কষিতকাঞ্চন বা লিলি নহে। সুতরাং, প্রকৃতির মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার এবং রং ফলাইবার বস্তুরও নিতান্ত অভাব নাই। ভিক্টর কাসিন্ বলেন, "বাস্তব-বর্জ্জিত আদর্শে প্রাণের অভাব লক্ষিত হয়, অপর পক্ষে আদর্শ-বর্জ্জিত ভাবে নিছক সৌন্দর্য্যের অভাব দৃষ্ট হয়;—সৌন্দর্য্য অসম্পূর্ণ প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণমাত্র নহে।" অনেকে আপত্তি করেন, নিসর্গচিত্র বাস্তব (true to Nature) নহে। কিন্তু বাস্তব বলিতে কি বুঝায়? মনোনয়নে পূর্ব্বদৃষ্ট কোন নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করুন, দেখিবেন, পর্ব্বত-গুলি উচ্চতর, গুহাসকল দুর্নিরীক্ষ্য, দুরব-গাহ! মোটের উপর বাস্তবের সহিত তাহার অন্তর বিস্তর। সুতরাং ধারণা (Impression) অনুযায়ী হইলেই তাহাকে 'বাস্তব' (True and Exact) বলিব, অন্যথা নহে। রাণা প্রতাপসিংহকে আমি চাক্ষুষ দেখি নাই— তাঁহার বীরত্বের, ত্যাগের, স্বদেশপ্রাণতার সহস্র কাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে তাঁহার একটা রূপ খাড়া করিয়াছি। এই রূপটী তাঁহার বাস্তব-রূপ নহে, তাঁহার আদর্শ-রূপ। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন লেখকের পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা কোন শিল্পীর শিল্পের আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে একটী ধারণা পোষণ করি—তাঁহার আকৃতি-সম্বন্ধে যে কল্পনাটী করিয়া রাখি, তাহার সহিত বাস্তব-মনুষ্যের প্রভেদ অনেক।

কল্পনার আদর্শের সহিত বাস্তব-লোকটীর মিল হয় না বলিয়া আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হই। কারণ আর কিছুই নয়, কেবল আমাদের আদর্শের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। অপর পক্ষে, যে ব্যক্তি প্রতাপের ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া নিজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বসে, সে জিনিসটাকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, আমার মনের ভাব কিরূপ হইত এবং প্রতাপের কিরূপ হওয়া সম্ভব ছিল, এ দু'য়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সুতরাং, যে অভিনেতা আদর্শের স্বরূপটী যতটা পরিমাণে দেখাইতে সমর্থ হইবে, সে তত স্বাভাবিক অভিনয় করিল, বলিতে হইবে। সাহিত্যের কথা তুলিয়া এখানে সময় নষ্ট করিতে চাই না। 'ফোটো-গ্র্যাফি'ও প্রতিকৃতি-চিত্রের এইখানেই বৈষম্য। আলোকচিত্র শুধু মানুষের বাহ্যঅবয়বটী আঁকিয়া দেয়, কিন্তু মানবহস্তলিখিত চিত্র বাহ্য অবয়বের সহিত মানুষের অন্তরের চিত্র অঙ্কিত করে। মনস্বী কার্লাইল বলিয়াছেন—"অনেক সময়ে কোন লোকের একখানি প্রতিকৃতি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বহুসংখ্যক জীবনেতিহাসের চেয়েও শিক্ষাপ্রদ অথবা প্রতিকৃতি একটা জ্বলন্ত দীপশিখার মত, যাহার সাহায্যে মানবের জীবনেতিহাস অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কাররূপে পাঠ করা যাইতে পারে।" নেপোলিয়ন একজন দিগ্বিজয়ী বীর ও অলৌকিক প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। আলোকচিত্রের কৃপায় আমরা তাঁহার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ বহুবার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে মূর্ত্তি আমাদের মনঃপূত হয় নাই? ঐ কি সেই নেপোলিয়ন, খর্ব্বকায় একটী সাধারণ মানুষ? আর ঐ তাঁহার অশ্ব নিতান্ত বিশেষত্ববর্জ্জিত—একান্ত সাধারণ? নেপোলিয়নের আকৃতি-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকৃত নেপোলিয়ন হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার অলোক-সামান্যত্ব দেখাইবার ক্ষমতা আলোক-চিত্রের নাই; নেপোলিয়নের বিশেষত্ব ফুটাইতে সমর্থ চিত্র-কলা—ফোটো এখানে অকিঞ্চিৎকর। Real বা স্বাভাবিক (ইহার সাধারণ অর্থে) হইলেই যদি সব জিনিস শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে আজ এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, ডাভিঞ্চি, টার্ণার টিশিয়ন, রুবেন্স, ভ্যানডাইক, সার জোশুয়া, অবনীন্দ্র, নন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্রের মূল্য এত অধিক হইত না,—তাহা হইলে আজ আর্টের উপর আলোকচিত্রের বিজয়কেতন পত্‌-পত্‌-শব্দে উড্ডীয়মান দেখিতে পাইতাম।

নিম্নশ্রেণীর চিত্রকরগণের একটী মহান্ দোষ—তাহারা একজন প্রতিভাবান্ চিত্রকরের অন্ধ অনুকরণ করে, তাঁহার চিত্রসমূহই অধ্যয়ন করে কিন্তু ঐ প্রতিভাশালী চিত্রকর কিসের অনুশীলন করিয়াছিলেন, সে খোঁজ লয় না। তাহাদের বাসনাটা না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার ইচ্ছার মত—দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত করিয়াই গ্রন্থকার হইবার প্রয়াসের মত, হাস্যজনক। যিনি যাথার্থই উচ্চাঙ্গের শিল্পী হইবার বাসনা পোষণ করেন, তাঁহাকে প্রকৃতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে হইবে—ঘটনাবায়ু-হিল্লোলে সতত কম্পিত, মানব-হৃদয়ের নব নব ভাবতরঙ্গের অনাহত ধারার সঙ্গে আত্মার একান্ত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে,—মনে করিতে হইবে, এই নিখিল বিশ্বে কুৎসিত কিছুই নাই—সকলই

সুন্দরত্রয়ের সুন্দরতার অভ্রান্ত বিকাশ!—এক কথায় "অরূপরতন আশা করিয়া রূপসাগরে" ঝাঁপ দিতে যিনি পারিবেন, তাঁহারই শিল্প-সাধনা ধন্য ও জয়যুক্ত হইবে—তিনিই মানবের মনোমন্দিরে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান থাকিবেন।

"জগতে আমরা যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়; যদি সম্ভবও হইত, তবে সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা চলিত না। বস্তুর আকার ও বর্ণ অনুকরণ করা কতকটা সহজ; কিন্তু কেবল আকার ও বর্ণের একটা অসম্পূর্ণ প্রতিরূপকে ত শিল্পলিপি বলা চলে না। * * * প্রত্যেক রূপ একটী ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকেই। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটী আঁকা তখনই সার্থক, যখন শিল্পী তাঁহার চিত্রিত ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের ভাবমাধুর্য্যের ইঙ্গিত করিতে পারেন।"

কোন একটী দৃশ্য দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া শিল্পী যে ভাবটি অনুভব করেন, তাহার আভাস দেওয়াই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। আভাস বলিলাম এইজন্য যে, একই চিত্র বিভিন্নরুচি লোকের নিকট বিভিন্নরূপে ধরা পড়ে। "ভাবব্যঞ্জক শ্রেষ্ঠ চিত্রের একনামে সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা কঠিন। নাম লিখিয়া না দিলেও যাহা সহস্র দর্শকের কাছে একই বিষয় বলিয়া ধরা পড়ে তাহা পট, আলেখ্য বা চিত্র নয়।" বস্তুতঃ শিল্প ভাবের চিত্র, গাছপালা-লতাপাতা-পাহাড়-পর্ব্বত-জীব-জন্তুরূপ ভাষার সাহায্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। চিত্রশিল্পী ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স্ এর ভাষায় বলিতে গেলে চিত্রকর "paints ideas, not objects"—ভাব চিত্রিত করেন, কোন বস্তু চিত্রিত করেন না। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই যথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাবপ্রধান চিত্রসমূহের মধ্যে ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স্ এর অঙ্কিত "আশা"-নামক রমণীয় আলেখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসীমশূন্যের মধ্যে একটা নারী দুলিতেছে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বদ্ধ!—ইহাই উক্ত চিত্রের পরিকল্পনা। কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী! আশা অন্ধ, সে চক্ষু মেলিয়া চাহে না, অসীম শূন্যের মাঝে তাহার বসতি। বাস্তবিক মানুষ কি না আশা করে? সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও চাহিয়া দেখে না,—মাদুরে শয়ন করিয়াও লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখে। আশার মত শূন্যগর্ভ আর কি আছে? চেষ্টরটন্ বলেন—"এই ছবিখানির সম্মুখে দাঁড়াইলে মানবজীবনের নিগূঢ়তম সত্যটার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়।" চিত্রকর গিদোরেণের পরিকল্পিত "বিয়াত্রিসে সেঞ্চি" বিশেষজ্ঞ সমালোচকগণের মতে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদ-ভাবব্যঞ্জক চিত্র। জগদ্বিখ্যাত র্যাফেল-অঙ্কিত "মাতৃমূর্ত্তির" সবিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

ভাবপ্রধান চিত্রাবলির মধ্যেও অনুকরণের অংশ একেবারে নাই, এমন নহে। ডাভিঞ্চির "মোনালিসা"ও অনুকরণ; কিন্তু ইহা সাধারণ অনুকরণ নহে—বাস্তবের ভিত্তির উপর ভাবের অমর নিকেতন—প্রকৃতির সহিত শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুভূতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অনুকরণ নিম্নশ্রেণির চিত্রকরগণের

সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে অনুকরণমাত্রই দোষাবহ নহে এবং অনুকরণের কোনও মূল্য নাই, এ-কথাও ঠিক্ নহে। "উড়িতে যতদিন শক্তি না পাইয়াছি, ততদিন নীড় ও তাহার গণ্ডীর আবশ্যকতা আছেই। গণ্ডীর ভিতরে বসিয়াই গণ্ডী পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়। তারপর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। বাঁধ, চলিতে শিখিবার পূর্ব্বে আমাদের বিপথ হইতে ফিরাইবার জন্য, দাঁড়াইতে শিখিতে দিবার জন্য, চিরদিন ঘরের কোণে আমাদের অশক্ত অবস্থায় আমাদের বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নহে। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নহে, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া যেমন কেহ ধার্ম্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া কেহ শিল্পী হয় না।"* মানবের নূতনের প্রতি অনুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ, মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা অনির্ব্বচনীয়। সীমার পিঞ্জরের মধ্যে মানবাত্মা দুইদিনেই হাঁফাইয়া উঠে, শিকল ছিন্ন করিয়া "নব রে নব নিতুই নব"র সন্ধানে সে বাহির হইয়া পড়িবেই। ভাবের যে একটা মানসিক মহিমা আছে, তাহা চিত্র-শিল্পকে উন্নীত করে এবং অন্ধ অনুকারী (mere mechanic) ও শিল্পীর মধ্যে যে একটী প্রভেদরেখা টানিয়া দেয়, সে বিষয়ে সুধীগণ একমত।

অনুকরণ শিল্পসৃষ্টির সহায়ক, চরম উদ্দেশ্য নহে।† শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবনও করিতে হইবে। আর্টি-ষ্টের পক্ষে কেবল মনোজ্ঞ দৃশ্যের মনোনয়নই যথেষ্ট নয়, তাহা ছাড়া গভীরতর এবং মধুরতর এমন কিছুর যোজনা আবশ্যক, যাহার দ্বারা আমাদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিনিচয় সহজেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। একজন ধনী গিদো-অঙ্কিত রমণী-মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের আদর্শ কোথায়। গিদো তাঁহার সম্মুখে একজন কুৎসিৎ ব্যক্তিকে রাখিয়া একটী সুন্দর ম্যাগ্‌ডালেন্-মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। 'মডেল' যাহাই হউক্, কিছুই যায় আসে না; কারণ, ভাব শিল্পীর হৃদয়ে।

এই স্থানে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। কাব্যের যে প্রয়োজন, চিত্রের প্রয়োজনও কতকটা সেইরূপ—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা জন-সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন। শ্রেষ্ঠ আর্ট-মাত্রেই মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি—মানবমনের উদার ভাবরাশির মণিমঞ্জুষা। কাব্যের ন্যায় চিত্রেও লোকশিক্ষার অংশ কিছু নাই এমন নহে। উভয়ের আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে এক হইলেও পার্থক্য কিছু নাই, এ-কথা বলা যায় না। কাজিন বলেন, "ললিতকলা-সন্দোহের মধ্যে কাব্যের আসনই সকলের উচ্চে; কারণ কাব্য অনন্তের যতটা আভাস দিতে সমর্থ, এমন কোন কলা নহে; এবং সকল আর্টই বহুল পরিমাণে কাব্যের নিকট ঋণী।" লেসিং বলেন, "একটা কবিতা এক গ্যালারি চিত্রের ন্যায় মূল্যবান্।" সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রশিল্প কোন অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে রূপদান করিয়া তাহার সম্বন্ধে আমাদের অন্তঃকরণে

---

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† "Imitation is the means, not the end of Art." Avebury.

যেরূপ পরিস্ফুট ধারণার সঞ্চার করিতে সমর্থ, কাব্য সেরূপ নহে। কিন্তু সেই বস্তুটীকে একবার দেখার পর কবি তাহার বিষয়ে এমন অনেক গুপ্তকথা আমাদের জানাইয়া দেন, যাহা চিত্রশিল্পীর পক্ষে অসম্ভব। "শিল্পের রাজ্য পরিমাণ,—কাব্যের রাজ্য সময়"—"Space is the domain of Art, time of Poetry."

চিত্রকর একান্ত ভাবপ্রবণ, শিল্পী কতকটা Practical. কবির পক্ষে একটী (Suggestion) ব্যঞ্জনাই হইল যথেষ্ট, তাঁহার মতে সেটা খোলসা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেই সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহাকে যদি বলা যায়,—ঐ সাদা দাগটী একখানি জাহাজ, আর ঐ কাল দাগটী ঝড়, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন এবং ভাবপ্রবণ কল্পনার সাহায্যে একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবেন। চিত্রকর কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত নহেন, (detail) বাহুল্যের প্রতি তাঁহার খুব নজর; তিনি তুলির পর তুলি টানিয়া প্রত্যেকটী প্রকাশ না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলা বাহুল্য, কবি-প্রকৃতিক শিল্পী এবং শিল্পি-প্রকৃতিক কবিরও অভাব নাই। ভারতীয় চিত্রকরগণ যেন অনেকটা কবিরই মত। উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত "শেষ বোঝা"-নামক সুন্দর চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটী উট নতজানু হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড একটা বোঝা;—সমস্ত আকাশ রক্তিমাভ। এই তিনটী মাত্র বস্তুর সাহায্যে শিল্পী অতুদার এক ভাবের আভাস দিয়াছেন। জীবগণ যুগ যুগ ধরিয়া ভগবানের চরণে তাহাদের পাপ-পুণ্যের বোঝা নামাইবার জন্য সম্মুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বোঝা খসিলেই মুক্তি, নির্ব্বাণ। ভগবৎপ্রেমে তাহার হৃদয়-মন ভরপুর রহিয়াছে এবং তাহার হৃদয়ের রঙ্গিন নেশা গগনে পবনে সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বব্যাপী এক হোলির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সামান্য কথায় উচ্চভাব-প্রকাশ বস্তুতঃই কবিজন-সুলভ।

কাব্যে বা কবিতায় একমাত্র মনই কাজ করিয়া চলে; চক্ষুরিন্দ্রিয় পাঠে সহায়তা করে বটে, কিন্তু সে বাস্তবিক কিছু দেখে না। একটী কবিতা পাঠ করিয়া তাহার সমগ্র ভাবটীকে মূর্ত্তিদান করিয়া মনোনয়নে প্রত্যক্ষ করা বিশেষ দুরূহ; তবে চিৎকার করিয়া পাঠ করিলে খুব সহায়তা হয় বটে। কবিতায় মিল (Rhyme) থাকে বলিয়া পাঠ শেষ হইয়া গেলেও তাহার ধ্বনি বা ঝঙ্কার কানে লাগিয়া থাকে এবং সেই বেশের সাহায্যে আমরা পরিপূর্ণ ভাবটীকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি। চিত্রে বাহিরের সমস্ত রূপটী নয়নের মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়; কাজেকাজেই সেরূপটীকে আমরা হারাই না এবং অন্তর্ভূত সমস্ত সৌন্দর্য্যটীকে নিঃশেষে পান করিয়া লই। প্রকাশের কিছু বাহুল্য থাকায় কাব্যের চেয়ে চিত্র লোকরঞ্জন। একটী কবিতা বুঝিতে হইলে যতটা মানসিক শিক্ষার (Cultureএর) প্রয়োজন হয়, চিত্র বুঝিতে ততটা হয় না। সেই জন্য চিত্রবিদ্যার পর্য্যালোচনায় অপেক্ষাকৃত সহজেই মানবের সৌন্দর্য্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমার মনে হয়, এই একই কারণে, চিত্রের সাহায্যে লোকশিক্ষার

কার্য্য দ্রুততর সম্পাদিত হইতে পারে। "সত্যকথা বলিলে সদ্‌গতি হয়, অতএব সত্য-কথা বলা উচিত"—এই নীতিবাক্যে যতটা কাজ হইবে, এই ভাবাবলম্বনে অঙ্কিত এক-খানি চিত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হওয়া সম্ভব, এবং এইখানেই চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য আনন্দ-বিত-রণ করা—শিক্ষা দান করা নহে। আমার মতে এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।—সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ, যাহাতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষা লাভ করি। তবে এই শিক্ষার অংশটা আন-ন্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা উচিত। সংসারে লোকে নিয়তই আমাদের শিক্ষা দিতেছে; "এটা করিও না, এরূপ বলা উচিত নয়, সত্য কথা বলিবে" প্রভৃতি সর্ব্বজনীন উদার নীতিবাক্য অহরহঃ আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাহার উপর চারুকলার ভিতরেও যদি নীতিকথা পরিষ্কারভাবে লিখিত থাকে, তবে আর কেহ চারুকলার অনুশীলন করিবে না। মানুষের স্বভাব এই যে, সে কাটাছাঁটা উপদেশের চেয়ে আনন্দের সঙ্গে উপদেশ লাভ করিতে সমধিক ব্যগ্র। সুতরাং আর্টের সীমা হইতে শিক্ষাকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া চলে না। যেমন আর্টের মধ্যে মুখ্যভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, সেইরূপ কি মুখ্য কি গৌণ, কোন ভাবেই দুর্নীতি প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের শিল্পকলায় অনেক দুর্নীতি-প্রকাশক ব্যাপার আছে, বিশেষতঃ চিত্রকলার মধ্যে। পুরীতে ৺শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের পুণ্যমন্দিরের পৃষ্ঠ অদ্যাপি নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ চিত্রসমূহে পূর্ণ। গ্রীক শিল্পেও আমরা কুরুচির বহু পরিচয় পাই। এই সকল ব্যাপারকে যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করার পক্ষপাতী আমি নহি। তবে ইহার কারণ অবশ্য একটা কিছু আছেই। বাস্তবিক "শিল্পী তাহার সময়ের সন্তান" কথাটী খুব সত্য। সময় ও আবেষ্টনের প্রভাব আর্টিষ্টের উপর অসাধারণ। কাজে-কাজেই দেশের যখন সাধারণ রুচিবিকার উপস্থিত হয়, তাহার হস্ত হইতে শিল্পীও অব্যাহতি পান না। দেশের লোক যখন অবস্থা আদর্শের পক্ষপাতী, তখন আমি উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিলেই বা অব্যাহতি পাইব কিরূপে? ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে স্বীকৃত যে, দেশাত্মবোধ ও নৈতিক জাগরণের দিনেই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়;—যেমন ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের যুগ। দেশের নৈতিক দুর্দ্দশার দিনে শিল্পসম্পর্কীয় স্থায়ী কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই।—উদাহরণ-স্বরূপ কবি ড্রাইডেনের যুগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুবিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ তাঁহার "ইন্‌টেন্‌শন্‌স্‌"-নামক গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন, "আর্টমাত্রেই নীতিশূন্য—All art is immoral." আমার মতে আর্ট নীতিশূন্য (immoral) ত নহেই, এমন কি (non-moral) নীতিবিচার-বহির্ভূতও নহে। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ-সুশৃঙ্খলার সহিত বাস করিতে গেলে নীতির সম্মান রক্ষা করিয়া চলা অপরিহার্য্য। সুতরাং কোন (artistic production) শিল্পলিপির মধ্যে দুর্নীতির পরিচয় পাইলেই তাহার বিচার আমাকে নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কেন না, সেটা শীঘ্রই দেশমধ্যে প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা এবং অশিক্ষিত ও দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য সহজেই

মন্দের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। অতএব চিত্রে, সাহিত্যে বা ভাস্কর্য্যের মধ্যে কুরুচি থাকা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যুত সেই সকল ভাবেরই প্রকাশ থাকা উচিত, যাহার দ্বারা মন উন্নত হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, ভগবানের অজস্র কৃপার পরিচয়ে মস্তক তাঁহার শ্রীচরণে স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

শ্রীবিনায়ক সান্ন্যাল।

সোণার হার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুরাও বিজয়নগরে পৌছাইয়া অবিলম্বে রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। বাহক ও অনুচরবর্গ সিংহদ্বারে থাকিল। প্রধান নায়কের মুখে দেবরায় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "বিজয়নগরের উপযুক্ত মহিষী! তাঁহাকে না লইয়া আসিলেন কেন? কুলবর্গের সুলতানের ভয়ে?" ক্ষুব্ধ সৈনিক উত্তর করিলেন, "মহারাজাধিরাজের আদেশ প্রতি-পালন করিতে পারি নাই,—পদচ্যুত করুন। এ-বয়সে ও-অপবাদ দিবেন না।" দেবরায় বলিলেন, "সৈন্য প্রস্তুত করুন, আজই মুদ্‌কল-অভিমুখে যাত্রা করিব।—সে দর্পিণীকে বন্দী করিয়া আনিয়া বিজয়নগর-রাজপ্রাসাদের অধিশ্বরী করিব।" মধুরাও কহিলেন, "মহা-রাজাধিরাজ! বহ্নিকে বন্দী করিলে অঙ্গুলী দগ্ধ হয়।" দেবরায় বলিলেন, "শমীবৃক্ষের ন্যায় সে অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিব।" মধুরাও বলিলেন, "মুদ্‌কল কুলবর্গ-সুলতানের অধীন; ইহাতে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে।" দেবরায় উত্তে-জিত ভাবে বলিলেন, "ভ্রাতার রাজত্বকালে কোন যুদ্ধের পূর্ব্বে ত' এ পরামর্শ দেন নাই! বাস্তবিকই কি আপনার বাহুবল ক্ষীণ হই-য়াছে?" একটি কঠোর উত্তর মধুরাওয়ের জিহ্বাগ্রে আসিল—দৃঢ় ওষ্ঠাধরের মধ্যে সে উত্তর রুদ্ধ হইল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "প্রধান নায়ক বহুদিনের ভৃত্য, তাহার একটি অনুরোধ রাখিবেন? মুদ্‌কলে আমি যাইব না। সেখান হইতে একবার ক্রীতদাসের ন্যায় নত-মস্তকে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেখানে আর বীরদম্ভ সাজে না।" তিনি চলিয়া গেলেন। দেবরায় গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল-পরে প্রধান নায়ক আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে নৃপতির নিকটে আসিলেন। দেবরায়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে যাইতেছিলেন, হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া অভিবাদন করিলেন; বলিলেন, "কল্য মহানবমী উৎসব আরম্ভ হইবে। মহারাজাধিরাজের সম্মুখে দেশ-দেশান্তর হইতে মল্ল, বীর, হস্তী ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে আসিবে। সামন্তগণ আসিয়াছেন, মঞ্চ সজ্জিত হইতেছে। মহারাজা-ধিরাজ না থাকিলে সকল উৎসব আয়োজন ব্যর্থ। এই বৎসরের প্রারম্ভে লোকাচার্য্য-দেব বলিয়াছিলেন, "এ-বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ বিজয়-নগরের পক্ষে শুভ নয়।" দেবরায় বলিলেন, "ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য সে-রমণীর সম্বন্ধে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে রাজপুত্রবধূ হইবে।

যদি একটী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার ফলে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তবে বীরের ভীত হওয়া উচিত হয় না।” মধুরাও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রতিহারী পুরোহিত-লোকাচার্য্যের আগমন-সংবাদ দিল। ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নৃপতির বিজয়কামনা ও দীর্ঘ-জীবনের আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। আগামী দিনের উৎসবের কথা উত্থাপন করিতেই দেবরায় সমস্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া কহিলেন,‘কাল আমি মুদ্‌কল-যাত্রা করিব, উৎসবের প্রথমে আমার উপস্থিতি সম্ভব হইবে না।” ব্রাহ্মণ স্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন ; সহসা উঠিয়া বলিলেন, “মহারাজাধিরাজ, অভিযান স্থগিত রাখুন্। সুলতানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার অধীন প্রজার কন্যা অপহরণ করিলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবে,—সে যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় হইবে।” বিরক্তি গোপন করিয়া দেবরায় কহিলেন, “সুলতানের সহিত যুদ্ধ আজ কি আমাদের ইতিহাসে নূতন ? যে-দিন বাহমণি-সুলতান মহম্মদ-শা অন্যায়-যুদ্ধে পিতামহ বুক্ককে পরাজিত করিয়া নিরীহ প্রজার রক্তে হস্ত কলুষিত করেন, সেইদিন হইতে এ বিবাদের সূত্রপাত। কৃষ্ণাতীরে পরাজয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যা বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। যদি যুদ্ধই বাধে, শত্রুর রক্তে সে কালিমা-রেখা মুছিয়া ফেলিব, সে প্রতিশোধ-জ্বালা নিবারণ করিব।” ব্রাহ্মণ কহিলেন, “যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি না। দেবদেব বিরূপাক্ষ যেন বিজয়নগরের রাজপতাকা চিরবিজয়ী করেন্। কিন্তু যুদ্ধ এ-বৎসর আরম্ভ করিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।” দেবরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “পরাজয়ের ভয়ে বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর বিবাহ-বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন্ না। ব্রাহ্মণ ! দেবমন্দিরে আপনিই কৃষক-দুহিতার কথা বলিয়াছিলেন। সে-কথার স্মরণ হইতেছে না কেন ? ‘কৃষককন্যা রাজপুত্রবধূ হইবে’—এই যদি আপনার গণনা হয়, তবে সে গণনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ইহাতে আপনি বাধা দিতেছেন কেন, বুঝিতে পারি না।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “নৃপতির অধীর হওয়া শোভা পায় না ; আর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্যের অমঙ্গল আহ্বান করা রাজোচিত নহে।” দেবরায় একটি ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বাক্য শুনিয়া থামিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, “আপনি মহানবমীর এই কয়দিন অপেক্ষা করুন্, আমি মুদ্‌কলে গিয়া সেই কন্যার কর পুনরায় গণনা করিয়া আসি। কৃষক আমাকে চিনে, কাজে যথেষ্ট ভক্তিও করিত। যদি তাহাদের বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারি, তাহা হইলে লোকক্ষয়কর এ দারুণ সমর সংঘটিত হইবে না। দেবরায় কোনরূপে আত্ম-সংযত হইয়াছিলেন, এবার তাঁহার রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি সরোষে বলিলেন, “বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ একজন কৃষকের নিকট তাহার দুহিতার জন্য বার বার অনুনয় করিয়া পাঠাইবেন ! যদি পূর্ব্বের গণনার উপর নিজের বিশ্বাস না থাকে, তবে দেবমন্দিরে সে-কথার উত্থাপন করিয়াছিলেন্ কেন ? যদি গণনা মিথ্যা বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তবে প্রধান নায়ককে প্রেরণ করা বিজয়নগরের অপমান !—” ব্রাহ্মণ

বলিয়া উঠিলেন, “গণনা মিথ্যা!—” দেবরায় কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, “সাবধান, ব্রাহ্মণ! বজ্র লইয়া খেলা চলে না। সায়নাচার্য্যের বংশধর বুক্কের বংশধরের নিকট অনেক প্রত্যাশা করিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ রাজার বিচার্য্য-বিষয়।—ইহা ব্রাহ্মণের গণনা-অনুমোদনের অপেক্ষা করে না।” এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। মধুরাও ও লোকাচার্য্য শুনিলেন, দূরে উচ্চকণ্ঠে দেবরায় প্রতিহারীকে আদেশ দিতেছেন—“সামন্তগণকে সংবাদ দাও, এখনই মন্ত্রণা-সভা বসিবে।”

প্রধান নায়ক এতক্ষণ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। দেবরায় চলিয়া গেলেন দেখিয়া, তিনি ও পুরোহিত নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে প্রধান নায়ককে কহিলেন, “মধুরাও! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, কৃষ্ণার বর্ষাস্ফীত জলরাশির ন্যায় বিজয়নগর-বাহিনী বাহমণিরাজ্যের উপর পতিত হইবে। তাহার পর বর্ষার অবসানে যেমন নদীতট সঙ্কুচিত কৃষ্ণাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, মুসলমান-সৈন্যের হস্তে বিজয়নগরের সেইরূপ অবস্থা হইবে। কুক্ষণে বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম!” মধুরাও যেন কি ভাবিতেছিলেন; লোকাচার্য্যের কথা কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু হৃদয়গত হয় নাই। কিন্তু শেষের কথাটি হৃদয়ে পৌঁছাইয়াছিল। তিনি বলিলেন, “ভগবন্! যে রমণীকে রাজেন্দ্রাণী করিবার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাঁহাকে আনিতে পারিলাম না। যদি পারিতাম, বোধ হয়, বিজয়নগরের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকিতেন।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি এই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। এখনই মুদ্‌কল যাত্রা করিব, নৃপতির পৌঁছানর পূর্ব্বেই পৌঁছাইতে হইবে। দেখি, সব দিক্ রক্ষা করিতে পারি কি-না। কিন্তু, মধুরাও! আমার রাজধানী-ত্যাগের কথা যেন গুপ্ত থাকে। তুমি যাও, সভায় তোমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। যদি যুদ্ধ বাধে, দেবরায়কে রক্ষা করিও। সে আমার অপমান করিয়াছে, কিন্তু প্রপিতামহ সায়নের ব্রহ্মতেজের উপর এ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; তিনি স্বহস্তগঠিত এই রাজ্যের শান্তি-শীতল ছায়ায় বসিয়া বেদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার অনিষ্ট কামনা করিতে পারি না। আমার নিকট দেবরায় এখনও বালক—স্নেহের পাত্র। আজ যদি মায়াপ্পা এখানে থাকিতেন!—” ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মধুরাওয়েরও মনে হইতে লাগিল যে, মায়াপ্পা এ-সময়ে এখানে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত।

সামন্তগণ অবিলম্বে রাজসমীপে উপনীত হইয়া সভাগৃহের বহির্ভাগে আপন আপন পাদুকা রাখিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন এবং যুক্তকর ঊর্দ্ধে তুলিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন। দেবরায় মুদ্‌কল-অভিযানের বাসনা গোপন করিয়া বলিলেন, “সামন্তগণ, সুলতানের সঙ্গে শীঘ্রই সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। মহানবমীর পরেই আমরা রায়চূড় আক্রমণ করিব। আপনারা সমরসাজে সজ্জিত হউন।” যাঁহারা বর্ষীয়ান্, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “মহারাজাধিরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ-বাধানর এখন সময় নহে।” একজন যুবক

সামন্ত আস্ফালন করিয়া বলিলেন, "গণ্ডীকোটা-দুর্গাধীশ্বরের, বোধ হয়, কৃষ্ণাতীরের কথার স্মরণ হইতেছে। মহারাজাধিরাজের নিকট প্রার্থনা এবার তাঁহার উপর রাজপুরী-রক্ষার ভার সমর্পিত হউক্।" শিব-সমুদ্র হইতে উত্থিত শ্বেত বাষ্পরাশি প্রভাতের অরুণ-কিরণ-স্পর্শে যেরূপ আরক্তিম হইয়া উঠে, সেইরূপ বৃদ্ধ-সামন্তের বদন—শুভ্র কেশমূল-পর্য্যন্ত—ক্রোধ-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! যদি সে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে, তবে ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে না। তোমার পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কৃষ্ণাতীরে তোমার পিতার মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করিবেন।" যুবকের পিতৃব্য বাকাপুরের সামন্ত, নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বীর! বিনায়ক বালক, তাহার দোষ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজাধিরাজের আদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হইবে, তাহার বিচার করুন্।" আদোনী-দুর্গাধিপ কহিলেন, "প্রধান নায়ককে দেখিতেছি না। তিনি কি এখানে নাই?" এমন সময় মধুরাও প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "প্রধান নায়ক কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে গিয়াছিলেন্—তিনি আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন্।" আদোনী-দুর্গাধিপ কহিলেন, "প্রধান নায়কের মত কি?" মধুরাও বলিলেন, "সামন্তবীরগণ মতামত প্রকাশ করিতে পারেন্ প্রধান নায়ক বেতনভুক্ ভৃত্য,—তিনি রাজ্য-দেশ পালনের জন্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" যুদ্ধের জন্য যাহারা প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্য অপ্রতিভ হইলেন। দেবরায় সেনাপতির অভিমান বুঝিলেন,—সস্নেহে বলিলেন, "প্রধান নায়ক! যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে হইবে।" তদুত্তরে প্রধান-নায়ক বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জন্য প্রাণ দিতে পারি। বিজয়লাভ ভগবান্ বিরূপাক্ষদেব ও বিঠল-দেবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।" দেবরায় বলিলেন, "প্রধান নায়কের জীবন মূল্যবান্—তাহা নষ্ট হইলে চলিবে না।" মধুরাও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন দেখিয়া দেবরায় সামন্তগণকে কহিলেন, "আপনারা আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন্।" গণ্ডী-কোটার সামন্ত বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! যুবকেরা যখন রণতৃষ্ণায় অধীর হইয়াছে, বৃদ্ধগণ তখন নিরস্ত থাকিতে পারেন্ না। যুদ্ধই হউক। প্রতিবৎসর মহানবমীর সময় গণ্ডীকোটা হইতে যে রাজস্ব আসে, এবার তাহার দ্বিগুণ আসিবে। মহারাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী হউন্। সাম্রাজ্য অক্ষয় হউক্।" অপর সকলে সে চীৎকারেরপ্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন, "যুদ্ধই হউক্। আমরা কৃষ্ণাতীরের অপমানের প্রতিশোধ লইব—সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিব।" দেবরায়ের আদেশে রাজভৃত্য দুইটি চামর লইয়া আসিল। শ্বেতচমরীপুচ্ছ-শোভিত রত্ন-খচিত স্বর্ণদণ্ড-দুইটি সম্রাট্ স্বহস্তে গণ্ডীকোটাধিপকে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ সামন্ত শির নত করিয়া সে মহা সম্মান গ্রহণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মহা-রাজাধিরাজ! এ সম্মান ন্যায়তঃ ত্র্যম্বকের পুত্রের প্রাপ্য; কারণ, যুদ্ধে আমার প্রথমে অনিচ্ছা ছিল, যুবকের ধিক্কারে আমার চৈতন্য হয়। যদি মহারাজাধিরাজের অনুমতি হয়, আমি এ সম্মান উপযুক্ত পাত্রে দান করিতে পারি। দেবরায় মণিবন্ধ হইতে

বলয় উন্মোচিত করিয়া বলিলেন, "ও সম্মান আপনারই প্রাপ্য। বিনায়ক রাওকে আমি এই বলয় দান করিব।" বিনায়ক রাও বলয় লইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন করিলেন এবং তাহা ভূতলে রাখিয়া দিলেন। সভাভঙ্গ হইলে শিবিকারোহণ করিবার সময় গণ্ডী-কোটাধীশ্বরকে নিম্নকণ্ঠে আদোনীরাজ বলিলেন, "উৎসবের সময় সৈন্যসজ্জার সুবিধা হইবে, কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

সভাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু প্রধান-নায়ক তখনও দাঁড়াইয়া। দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছিল। প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলিকে একটা আধ-আলো আধ-অন্ধকারের অস্পষ্ট আবরণ ঘেরিয়া ফেলিতেছিল। বিরাট দীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যদিয়া প্রস্তর-মন্দিরের চূড়াগুলি দেখা যাইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দেবরায়ের তরুণ বদন বাহিরের ক্ষীণ আলোক-প্রভায় মণ্ডিত। প্রধান-নায়কের মুখ অন্ধকারে আবৃত। ক্রমে হেম-দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল। কিঙ্কর চলিয়া যাইলে দেবরায় বলিলেন, "এ-যুদ্ধে আপনার এত অনিচ্ছা কেন? গণনার উপরে আপনাকে ত' কখনও এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেখি নাই। ইহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারি কি?" উদাসীনভাবে মধুরাও বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ আপনি—।" দেবরায় আসন হইতে দ্রুত উঠিয়া আসিয়া প্রধান নায়কের হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আজ বার বার 'মহারাজাধিরাজ'-সম্বোধন কেন? প্রথমে আমি লক্ষ্য করি নাই, তার পর ভাবিতেছিলাম, আপনি লোকাচার্য্য ও সামন্ত-গণের সম্মুখে সভার প্রথা রক্ষা করিতেছেন। এখন আমি সেই দেবরায়, আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করুন।" বীর হৃদয় এতক্ষণে বিগলিত হইল। মধুরাও রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার উত্তর প্রীতিকর হইবে না।" বালক যেমন হাসিয়া উঠে, বিজয়নগরের নবীন নর-পতি সেইরূপ হাসিলেন। তাঁহার মুখকান্তি স্বভাবতঃ সুন্দর নহে, কিন্তু সরল হাস্যে উদ্ভাসিত হইলে, তাহার মধ্যে একটি কমনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিত। দেবরায় বুঝিয়াছিলেন যে, শরতের মেঘের মত প্রধান নায়কের অভিমান চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার হৃদয় নীলাকাশের ন্যায় স্বচ্ছ। তিনি কহিলেন, "সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপনি কবে আমায় প্রীতিকর কথা বলিয়াছেন?" মধুরাও বলিলেন, "উচিত কথা বলিতে কখনও সঙ্কুচিত হই নাই,—ওরূপ কথা তিক্তই হইয়া থাকে।" দেবরায়ের মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমাকে আজ সেই তিক্ত সত্যই বলুন!" মধুরাও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; পরে বলিলেন, "আমার অশ্বা-রোহী নাই, যুদ্ধাশ্বগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। সাম্রাজ্যের বেতনভুক্ সমস্ত সৈনিক আজ পদাতিক। এই কয়মাস আমি তাহাদের তীর, ধনুক, বল্লম অভ্যাস করাইতেছি। যদি এক বৎসর তাহাদের এইরূপ শিক্ষা দিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা অজেয় হইবে। কল্য যুদ্ধ বাধিলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।" বিস্ফারিত-নেত্রে দেবরায় মধু-রাওয়ের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। দূর রাজপথ হইতে নাগরিকগণের কোলাহল সান্ধ্যপবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। পরদিন উৎসব—এ কোলাহল তাহারই পূর্ব্বাভাস।

কিন্তু সে-শব্দ দেবরায়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি স্তম্ভিতভাবে বলিলেন, "আমার অশ্বারোহী সৈন্য নাই! বিজয়নগরের দক্ষিণ হস্ত আজ ভগ্ন! আপনি এ কথা ত' পূর্ব্বে আমায় বলেন্ নাই।" মধুরাও বলিলেন, "প্রয়োজন বোধ করি নাই।" দেবরায় বলিলেন, "আর কাহারও মুখে শুনিতেও পাই নাই।" মধুরাও বলিলেন, "আমার প্রকৃত কথা কেহই জানিত না। তীর ধনুক অভ্যাসের কথা অনেকেই জানিত, কিন্তু সে অভ্যাস যে এরূপভাবে হইতেছে, তাহা কেহ সন্দেহ করে নাই। আর সন্দেহ করিলেও আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট অভিযোগ আনিবার সাহস কাহার হইত?" দেবরায় কয়েকবার কক্ষে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বিহ্বলভাবে কহিলেন, "আমার অশ্বারোহী সৈন্ত নাই! বিজয়নগরের মান নগণ্য পদাতিকের হস্তে!" মধুরাওয়ের মস্তক চিন্তাভারে নামিয়া পড়িয়াছে,—সহসা সদোজাগরিতের ন্যায় বলিলেন, "যেটুকু শিক্ষা দিয়াছি, তাহাতেই বুঝিবে যে তাহারা নগণ্য নহে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সামন্তের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্ত আছে; তোমার দেহরক্ষী সৈন্তদল আমি ভাঙ্গি নাই। আমার অধীনস্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্তই কেবল তীরন্দাজ ও বর্শাধারী পদাতিক হইয়াছে। সমস্ত সৈন্ত এক করিলে প্রায় দেড় লক্ষ হইবে—চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তাহাদের আড়াই লক্ষে পরিণত করা যাইবে। যদি আমার পদাতিক সেনা আর ছয়মাস সময় পাইত, তাহা হইলে এ বাহিনীর বেগ দুর্দ্ধর্ষ হইত।"

মৃদু-পবন-স্পর্শে আন্দোলিত আম্র-কানন হইতে যেমন অস্ফুট শব্দ উত্থিত হয়, মধুরাওয়ের ওষ্ঠ হইতে কথাগুলি সেইরূপ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। সেগুলি আশা-নিরাশা-মিশ্রিত। প্রথমে তিনি দেবরায়কে সাহস দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সংগ্রামের গুরুত্ব ও আপন সৈন্তের অক্ষমতার কথা মনে উদিত হইল, তখন তাঁহার স্বর অতিনিম্ন হইয়া আসিল। দুই জনেই নৈশাকাশের দিকে চাহিলেন। আকাশ নির্ম্মল কিন্তু জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে নাই; কারণ, চাঁদের উপর একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ আসিয়া পড়িয়াছিল। মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল—আবার ধরণী কৌমদী-কিরণে স্নাত হইল। হস্তিশালা হইতে একটি অস্থির হস্তী বৃংহণ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাতাসে শব্দ মন্দীভূত হইয়াছিল, সেই জন্ম যেন তাহা বিষাদময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেবরায় হস্তিশালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মধুরাও দেখিতেছিলেন, আবার একখণ্ড মেঘ দুরন্ত শিশুর ন্যায় চন্দ্রের উপর আসিল। দেবরায় বলিলেন, "আমার হস্তী সব আছে ত'?" প্রধান নায়ক বলিলেন, "আছে। কিন্তু তাহাদিগকে সেনার পুরোভাগে স্থাপন করা হইবে না।" দেবরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" মধুরাও বলিলেন, "তাহারা ফিরিয়া আমাদের পদাতিক সেনা দলিত, মথিত করিয়া দিবে।" দেবরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তাহারা ফিরিবে না। আমি মৈনাকের উপর আরোহণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের লইয়া যাইব। আমি অগ্রে থাকিলে হস্তিসৈন্তের কেহ পশ্চাৎপদ হইবে না।" মৈনাক সম্রাটের প্রিয় হস্তী, মৈনাক-পর্ব্বতের মত তাহার বিপুল দেহ। এই রণদুর্ম্মদ

হস্তীই কৃষ্ণাতীরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল—আহত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণহীন দেহ লইয়া সুলতান ফিরোজের সহস্র অশ্বারোহীর ব্যূহ ভেদ করিয়া পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় দুর্ব্বার বেগে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। মধুরাও বলিলেন, "তাহা হইলে কৃষ্ণাতীরের যুদ্ধের পুনরভিনয় হইবে মাত্র।" হতাশ হইয়া দেবরায় বলিলেন, তবে হস্তি-সৈন্যও যাইবে না?" মধুরাও বলিলেন, "যাইবে, তবে তাহাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিব।" দেবরায় ভাবিতেছেন, ব্যবস্থার কথা মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় মধুরাও স্বর অতিকোমল করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! দেব! তুমি কি সত্যই সেই কৃষক-কন্যাকে ভালবাসিয়াছ? আমার নিকট তুমি কখনও কিছু গোপন কর না। বল, আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। তুমি ভালবাস কি-না শুনিতে চাই।" দেবরায় কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তার পর উচ্ছ্বাস-সহকারে বলিলেন, "হাঁ! মাধো ভালবাসি।" এ দেবরায়ের কৈশোরের সেই সম্বোধন! তখন দেবরায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি মধুরাওয়ের বন্ধু; সুতরাং মধুরাওকে 'মাধো' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। বালক দেবরায়ও ভ্রাতার দেখা-দেখি মধুরাওকে 'মাধো' বলিলেন। সে-দিন মধুরাও হাসিয়া বন্ধুর প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হইতে আমি তোমাদের দুই-জনারই 'মাধো'।" যে জীবন অনেক পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছেন, আজ মধুরাওয়ের মনে পড়িল সেই জীবনের কথা। মানস-চক্ষে এক একটি দিনের পট ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।—দ্রোণাচার্য্যের মত শিষ্য-পরিবৃত হইয়া মধুরাও দুর্গে বসিয়া!—সম্মুখে পার্শ্বে রাজপুত্রের দল আপনার পুত্রগণের সহ ক্রীড়ায় রত। কখনও ক্রীড়া দ্বন্দ্বে পরিণত হইতেছে, কখনও প্রবীণ সেনাপতিকে বালক হইয়া বালকের ক্রীড়ায় যোগদান করিতে হইতেছে। তখন মধুরাও একাধারে শিক্ষক, বিচারক ও বন্ধু।

যাহা হউক, সে সম্বোধনে মধুরাওয়ের হৃদয়ের নিভৃত কন্দর আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "দেব! দেখ নাই, তবু ভালবাস!" দেবরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখি নাই, কিন্তু আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিলাম, এ সিংহীকে না পাইলে জীবন বৃথা।" মধুরাও তখন ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্যের কথা ভাবিলেন।—ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেখানে যাইতেছেন, প্রীতা তাঁহার মুখে যখন শুনিবে যে, দেবরায় অলস বিলাসী নহেন, তিনি অবিবাহিত বীর যুবক, হয় ত' তখন তাহার মন কোমল হইবে। মধুরাও আরও ভাবিলেন যে, তিনি যদি প্রথমে পরুষভাব প্রকাশ না করিতেন, হয় ত তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। তিনি মনে মনে বারংবার বালিকার পিতৃভক্তি ও তেজস্বিতার প্রশংসা করিলেন। আবার চিন্তাস্রোত লোকাচার্য্যের প্রতি ধাবিত হইল। তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মণ যদি তিম্মাকে সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলেই কন্যার মত হইবে। মধুরাও জানিতেন যে, প্রীতার অমতেই তিম্মার অমত। দেবরায় দেখিলেন, মধুরাও কথা কহিতেছেন না। তিনি চাহিতেই মধুরাও বলিলেন, "তবে চল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।" বিস্মিত হইয়া দেবরায়

বলিলেন, "আপনি যাইবেন?" মধুরাও মলিন হাস্যের সহিত বলিলেন, "যাইব, তবে নিরস্ত্র হইয়া। যুদ্ধ করিব না; যদি রায়চূড়ের মুসলমান সৈন্য কোনরূপে সংবাদ পাইয়া উপনীত হয়, বিপদ্ ঘটিবে। সে বিপদে তোমার দেহ ঢাল দিয়া রক্ষা করিব।" দেবরায় মধুরাওয়ের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্রথমে যেটুকু আনন্দের আলোকে নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিলেন, "আমি এখানে থাকিব না, আপনি থাকিবেন না, সামন্তগণ কি ভাবিবেন?" মধুরাও বলিলেন, "এখনি প্রচার করিয়া দিব যে, তুমি অসুস্থ হইয়াছ। আমি না থাকিলে তাঁহারা ভাবিবেন যে, প্রধান নায়ক সৈন্য-সংগ্রহ করিতে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছে।" দেবরায় দেখিলেন, মধুরাও স্নেহের টানে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, মৃত্যুভয় মনে একবারও স্থান পাইতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি কহিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে আমার যাওয়া উচিত বোধ হইতেছে না। একজন সৈনিক কর্ম্মচারী পাঠাইলেই—।" মধুরাও বলিলেন, "অর্জ্জুন সুভদ্রা-হরণের জন্য কাহাকেও পাঠান নাই। এ-সব কার্য্যের ভার আর কাহাকেও দিতে নাই।" দেবরায় বলিলেন, "অর্জ্জুন যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর আমি যুদ্ধ করিব কতিপয় গ্রামবাসীর সহিত।" মধুরাও বলিলেন, "যুদ্ধ যদি হয়, গ্রামবাসিগণের সহিত হইবে না, রায়চূড়ের সৈন্যগণের সহিত হইবে। আমি যখন সেখানে গিয়াছি, সে-সংবাদ তাহারা পাইয়াছে, পথের মাঝে বা ফিরিবার সময় তাহারা বাধা দিবে।" দেবরায় বলিলেন, যদি মুদ্গলের অধিবাসিগণের সহিতই যুদ্ধ হয়?" মধুরাও বলিলেন, "তবে এ অভিযানে কাজ নাই।" মধুরাও দেখিলেন, দেবরায়ের মুখ ম্লান হইল; তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, দেবরায়ের শঙ্কা তাঁহারই জন্য। তিনি কহিলেন, "আমার জন্য আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। অভিযান হউক্। আমরা দুই জনেই যাইব। আমি চর্ম্মদ্বারা তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি যদি পার, আমাকে রক্ষা করিও।"

গভীর রজনীতে দুই সহস্র অশ্বারোহী নগর ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার অনেক পরে দেবরায় ও মধুরাও বহির্গত হইলেন। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। পানসুপারী-বাজারের প্রশস্ত পথ জনমানবশূন্য। তারার আলোক-সাহায্যে তাঁহারা অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। নগরীর প্রস্তর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া দেবরায় দেখিলেন—নগরীর বাহিরে কয়েকজন লোক বৃহৎ বৃহৎ মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মস্তকোপরি কুণ্ডলীবদ্ধ ধূমপুঞ্জ, নিম্নে চঞ্চল রক্ত-শিখা। চতুর্দ্দিকে প্রেতের ন্যায় অসংখ্য মূর্ত্তি কুব্জ হইয়া কি করিতেছে! নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাহারা মানুষ—গহ্বর-খননে ব্যাপৃত। মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কিসের জন্য?" মধুরাও বলিলেন, "যদি নগরী আক্রান্ত হয়, সেই জন্য এই উদ্যোগ। ওই গহ্বরগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভাকার প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হইবে; শত্রু-সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবে না। দেবরায় আর কোনও কথা কহিলেন না, সস্মিত-নেত্রে বারংবার প্রধান নায়কের আলোকদীপ্ত গম্ভীর মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

দয়ার বিচার।*

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব্ব করিতে চূর্ ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর্।

ঐ-গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে ;
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর্।

যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি ;
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর ;
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর্।

ভাবিতাম—"আমি লিখি বুঝি বেশ ;
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ" ;—
তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিল মোরে
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চূর্।

রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা রজনীকান্ত সেন। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

কল্যাণ মিশ্র————একতালা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
{ র্সা র্সর্সা II সা র্সা -া। র্সা র্সর্রা র্সা I না নর্সা -া। ধা পধা ধা।
আ মার্ স ক ল্ র ক০ মে কা ঙা০ ল ক রে০ ছে

০ ১ ২´ ৩
। [ধা -পা পা। গা গা গা I সা -রা -গরা। -নসা। ।] ।
। পা -ক্ষা পা। পা না ধা I পা ক্ষা -গা। -া পপা না }।
গ র্ ব ক রি তে চূ ০ ০ র্ ওগো 'স'

০ ১ ২´ ৩
। সঃ রাঃ গা ; সা -রগা গা I ক্ষা -পাঃ -ঃ। পা ধধধা ধা।
য শঃ ও অ ০র্ থ মা ০ ন ও স্বাস্ থ্য

* কিম্বদন্তি যে, [illegible] রোগ-শয্যাগত থেকে কান্ত-কবি এই গানখানি রচনা করেছিলেন। লেঃ

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্মপত্রিকা। *

(সংক্ষিপ্ত-বিবৃতি)

জন্ম-সময়, ইত্যাদি:—শকাব্দ ১৭৬২, ৩রা পৌষ, বুধবার, রাত্রি আনুমানিক ১৭ দণ্ড, ৫২ পল। ইং ১৮৪০, ১৬ই ডিসেম্বর, রাত্রি ১২। ২৩। ১৯ টার সময়।

স্ব, উ, ঘং ৬। ৩৬। ৩১
স্ব, অ, ঘং ৫। ১৪। ১৯
অয়নাংশ = ২১° ৪৩′ ৪৫″
চন্দ্রস্ফুট = ৫। ১৩। ৫৩।

	বৃষ	মেষ	মীন	
মিথুন			ইউরেনাস	কুম্ভ
কর্কট	কেতু	জন্ম-কুণ্ডলী	শুক্র, রাহু, নেপচুন	মকর
সিংহ	লগ্ন, চন্দ্র ১৩, মঙ্গল		রবি, শনি, বুধ, বৃহস্পতি	ধনু
	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	

বিংশোত্তরী দশা অষ্টোত্তরী দশা

চং = ৭।১।১২ বর্ষাদি। বৃ = ১৫।৯।২১ বর্ষাদি।

বর্ত্তমান জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহদের বিশেষত্ব:—

রবি, চন্দ্র, শুক্র উচ্চনবাংশস্থ; বৃহস্পতি নিজ বর্গোত্তম-নবাংশগত; শনি অস্তগত ও নীচ-নবাংশগত। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র অধিমিত্র-ক্ষেত্র, বুধ ও শনি মিত্রক্ষেত্র এবং মঙ্গল সমক্ষেত্রস্থ।

(জাতক প্রকৃতি)

(১) স্বভাবের কোমলতা, অসামান্য বিনয়, কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ-ভাব ও লজ্জাশীলতা, নিজেকে ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন-বোধ, প্রভৃতি আদর্শ-স্ত্রীবৃত্তি।—কন্যারাশি স্ত্রীরাশি; লগ্ন ও চন্দ্র উভয়েই স্ত্রীরাশিগত হওয়াতে এবং লগ্ন- ও চন্দ্র-রাশ্যধিপতি বুধও স্ত্রীরাশিগত হওয়াতে এই মহাত্মার প্রকৃতি অনেকটা পূর্ব্বোক্ত আদর্শ-

* ৮ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়কুমার মজুমদার, এম-এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং তাঁহার পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত।

৭৩৫

স্ত্রীবুদ্ধি-দ্বারা গঠিত। পরন্তু কন্যা শীতল-রাশি, উহাতে শীতলগ্রহ চন্দ্র অবস্থিত। লগ্নাধিপ বুধ শীতলরাশিস্থ এবং শীতলগ্রহ-বৃহস্পতি-যুক্ত। অতএব এই মহাত্মার প্রকৃতি স্বভাবতঃ শীতল। তথাপি ইঁহার প্রকৃতি একেবারে ক্রোধশূন্য ছিল না। অপূর্ণ মানুষে পূর্ণতা থাকিতে পারে না। তমোগুণী মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নগত হওয়াতে প্রকৃতিতে অনেক সময় উষ্ণতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু আত্মসংযম-শক্তি এতই প্রবলা ছিল যে, তিনি সহজেই ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারিতেন্। এই অমানুষিক আত্মসংযম-শক্তির কথা পরে বলিব।

(২) অলোকসামান্য সহিষ্ণুতা।——লগ্ন ও চন্দ্রাপেক্ষা তৃতীয়ভাবে সহিষ্ণুতার বিচার হয়। তৃতীয়-ভাবপতি মঙ্গল লগ্নস্থ হইয়া লগ্নপতি বুধের সহিত মুখ্য সম্বন্ধ করিয়াছে। তৃতীয়ভাবে শুভগ্রহ বুধ ও বৃহস্পতি বিদ্যমান। উহাতে অন্য কোন অশুভগ্রহের বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। এই নিখুঁত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রহসংযোগই এই অসাধারণ সহিষ্ণুতার মূল কারণ। প্রাণাধিক প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যু, অবস্থার বিচিত্র বিপর্য্যয়, ব্যক্তিগত মর্ম্মস্পর্শী অপমান, আর্থিক মহাকষ্ট প্রভৃতি জগতের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই মহাত্মার সহিষ্ণুতা ফলতঃই অলোকসামান্য ছিল।

(৩) অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম।—শক্তি ও বীর্য্যকারক মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ ; বিশেষতঃ লগ্নপতি বুধের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ; তৃতীয়ভাব বুধ ও বৃহস্পতিযুক্ত। এই সকল কারণে এই মহাত্মার কর্ম্ম-ক্ষমতা অসাধারণ ছিল ; তিনি অক্লান্তভাবে দিবারাত্র খাটিতে পারিতেন্। বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার কর্ম্মশক্তির নিকট সবল-দেহ যুবকের কর্ম্মশক্তি হার মানিত। এইরূপ কর্ম্মানুরাগ বাস্তবিকই জগতে দুর্লভ।

(৪) চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা।—ইহা অনেকটা চন্দ্রযুক্ত ও লগ্নগত মঙ্গলের ফল ; মঙ্গলগ্রহের শাসনাধীনে আসিলে, মানুষ বড় একগুঁয়ে এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। রবির সহিত শনি যুক্ত হইয়া ইহার উৎকর্ষ করিয়াছে। এই মহাত্মা যাহা একবার ধরিতেন, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতেন্ না।

(৫) গভীর মনঃসংযোগ ও সাধনীয় বিষয়ে নিমগ্নভাব।--লগ্নে স্থিরগ্রহ শনির প্রায় পূর্ণদৃষ্টি ; স্থিরগ্রহ মঙ্গলের স্থিতি ; এবং লগ্নপতি স্থির রাশিস্থ হইয়া স্থিরগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত এবং স্থিরগ্রহ মঙ্গলের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সকল কারণে এই মহাত্মা অধ্যয়ন কিংবা আরাধনা-কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য যোগীর ন্যায় একেবারে তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন্ ; কোন কর্ম্ম-সাধন-কালে সেই ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন্। এই সকল লক্ষণ তাঁহার শৈশব হইতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লগ্ন দ্ব্যাত্মক রাশি ও চরগ্রহ চন্দ্রযুক্ত এবং রবি দ্ব্যাত্মক রাশিস্থ হওয়াতে সময়ে সময়ে বিষয়-নির্ব্বাচন-কালে এই মহাত্মার বিলক্ষণ চাঞ্চল্য দেখিয়াছি। কিন্তু একবার বিষয়-নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাতে সর্ব্বদাই অটল থাকিতেন্।

(৬) বিদ্যা ও প্রজ্ঞা :—লগ্নপতি বুধ বিদ্যাকারক ; এবং বৃহস্পতি প্রজ্ঞাকারক। অতএব বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগ বিদ্যা ও প্রজ্ঞার সংযোগ। বর্ত্তমান স্থলে এই সংযোগ পূর্ণসংযোগ। এই কারণে এই মহাত্মা অধ্যয়নাদি-দ্বারা যাহা কিছু শিখিতেন, তাহাকেই

তিনি প্রজ্ঞারূপে পরিণত করিতেন। অর্থাৎ শিক্ষার্জ্জিত সমস্ত সুবিষয়গুলিই তাঁহার জীবনের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছিল। তিনি কেবল শিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, তদনুসারে জীবনকেও পরিচালিত করিতেন। 'To him, Knowledge was Wisdom and Wisdom was Virtue'. এ-স্থলে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-গ্রন্থ-বিশেষ হইতে কিছু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"In good aspect, and in the world of mind, this (conjunction of Jupiter and Mercury) harmonises the influences of intellect and devotion, or science and religion, bringing the one to the support of the other, & smoothing away antagonism, and will develop its influence in many ways, according to the native's station in life. According to the general status of the horoscope it will give a profoundly religious temperament, accompained by a broad intellect and a philosophical mind, or by much learning ; ** in any case, however, the power of Judgment will be well marked, and whatever his course, the native will steer it with both skill, and ease. It inclines to tolerance and broad-minded views in the domains of religion and intellect, strengthening both the intellect and the religious sentiments,and inclining to honesty, straightforwardness, candour, conscientiousness, mental balance, equanimity, good judgment. It enables the native to see all men as his brothers, to see the germs of truth in the most diverse opinions ; and thus it may act in various ways between the two extremes of a large-hearted toleration and philosophical indifference. It gives harmony and good-will between brethren and relatives, with mutual good fortune or good offices to or from either. It broadens the mind out towards general principles instead of confining it to details ; it tends to versatility and the study of many subjects rather than one and helps the native to be in some measure all things to all men. It may be one of the factors in genius and intuition. ** It gives journeying and travelling and changes genrally, both physical and mental.**"

—Alan Leo, How to judge a Nativity,
Part II pp. 96-97.

অর্থাৎ—বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগে জ্ঞান ও ধর্ম্ম,কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয়; একে অন্যের উন্নতি ও বিকাশের সহায়তা করে। জাতকে অন্যান্য শুভ-সংযোগ থাকিলে, ইহাতে প্রকৃতি ভক্তি ও ধর্ম্মাত্মক, এবং মন উদার ও দার্শনিকজ্ঞান-বিশিষ্ট হয়; কিংবা নিয়ত জ্ঞানচর্চ্চা, ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের অনুবর্ত্তিনী হয়। সদসদ্বিবেচনা-শক্তি সুপ্রস্ফুটিতা ও বলবতী হয় এবং যে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক, জাতক সর্ব্বদাই নিপুণতা ও সচ্ছন্দতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে। ধর্ম্মবিষয়ে সে উদার-মতাবলম্বী এবং ধর্ম্মান্তর-সহিষ্ণু হয়; তাহার চিত্ত, সাধুতা, সরলতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্থৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়। সে সকলকে স্বীয় ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করে; এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়-সকলের মধ্যেও সত্যের বীজ নিহিত দেখিতে পায়। এই সংযোগ ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় বন্ধুদের সহিত সম্প্রীতি প্রদান করে। ইহাতে চিত্ত এত

৭৩৫

প্রসারিত হয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা ও বিশেষত্বগুলি ভুলিয়া এক সর্ব্বজনীন সত্যের প্রতি প্রধাবিত হয়। ইহাতে চিত্তকে বহু বিষয়ে পারদর্শিতা দান করে এবং সকলের নিকটেই তত্তৎ মনোনীত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে সমর্থ করে। এই শুভ-সংযোগ প্রতিভা এবং অপরা দৃষ্টির একটী লক্ষণ। ইহাতে জাতক ভ্রমণশীল ও ভ্রমণপ্রিয় হয়।

(৭) পতনাদি আকস্মিক ঘটনা :—

"Mars, in any aspect to the Sun or Moon, gives vital heat and a good circulation, with the power to throw off diseases. But if in evil aspect,* it disposes to accidents".—Sepharial, A Manual of Astrology, P. 87.

অর্থাৎ—যদি চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের কোন অশুভ দৃষ্টি কিংবা যোগ থাকে, তবে পতনাদি অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এ-স্থলে মঙ্গল লগ্নস্থ হওয়াতে উক্ত ফলের বৃদ্ধি হইয়াছে। এই মহাত্মা অনেকবার গাড়ী, ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি হইতে পড়িতে পড়িতে, কিংবা পড়িয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। অনেক বার হাত, পা, কোমর, ভাঙ্গিয়া বহুদিন কষ্ট পাইয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক প্রকার আকস্মিক ঘটনা ইঁহার জীবনে ঘটিয়াছে।

(৮) রোগ প্রভৃতি।—অষ্টমপতি মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হওয়াতে এই মহাত্মা প্রায়শঃই মাথাধরা (শিরঃপীড়া) প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেন্। শুনিয়াছি, মস্তকের পীড়ার জন্য তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন্ নাই।

চন্দ্র ও লগ্ন মঙ্গলযুক্ত হওয়াতে ইনি অর্শোরোগেও বহুকাল কষ্ট পাইয়াছিলেন্। কেতু ব্যয়-ভাবের ফলদাতা হওয়াতেও উক্ত রোগ সৃষ্ট হইতেছে। যথা—

"শিখী রিপুফলো বস্তিগুহ্যাঙ্ঘ্রি নেত্রে রুজা।"—(চমৎকার-চিন্তামণি।) ইনি বহুকাল দাঁত ও মুখের পীড়াতেও কষ্ট পাইয়াছেন্।

(৯) স্ত্রীসৌখ্য ইত্যাদি :—লগ্নপতি বুধ ও জায়াপতি বৃহস্পতির সম্মিলন এবং চন্দ্র ও লগ্নাপেক্ষা সপ্তমে তদধিপতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং শুক্রের সপ্তমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে এই মহাত্মার সহিত স্ত্রীর বিশেষ সদ্ভাব ও মনোমিলন ছিল; কিন্তু লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমে মঙ্গল ও শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহাকে মনোবেদনা পাইতে হইয়াছিল।

(১০) সন্তান-হানি ইত্যাদি।—চন্দ্র ও লগ্নপেক্ষা পঞ্চমপতি শনি অস্তগত, নীচ-নবাংশস্থ ও রবিযুক্ত হইয়া দুর্ব্বল হওয়াতে এবং বৃহস্পতির পঞ্চমে মঙ্গল ও শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকাতে এই মহাত্মার কয়েকটী সন্তান-হানি হইয়াছে।

(১১) শত্রু ইত্যাদি।—লগ্ন ও চন্দ্রের ষষ্ঠে ইয়ুরেনাসের স্থিতি, রাহুর উক্তভাবের ফলদাতৃত্ব এবং ষষ্ঠপতি শনি অস্তগতাদিদোষে দুর্ব্বল হওয়াতে, এই মহাত্মার শত্রু-সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। অধিকাংশ লোকে ইঁহাকে অজাতশত্রু বলিয়া থাকেন্। কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুতঃ, ইঁহার শত্রুসংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ষষ্ঠভাবে ষষ্ঠপতি শনির পূর্ণদৃষ্টিই উক্ত অল্পসংখ্যক শত্রুর বিদ্যমানতার কারণ।

(১২) আয়ুঃ প্রভৃতি ঃ—এই মহাত্মা দীর্ঘায়ুর্যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ু-গণনা-প্রণালী অতিদীর্ঘ ও দুর্ব্বোধ; এজন্য উহা এ-স্থলে প্রদত্ত হইল না। ৬৪ বর্ষ বয়সের পরে দীর্ঘায়ুঃ-কালের আরম্ভ হয়। এই মহাত্মার ৬১ কি ৬২ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে যখন প্রথম দারুণ বহুমূত্র-রোগ ইঁহাকে আক্রমণ করে, তখন আমি গণনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ৬৪ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইবে না। ৬৪ বর্ষের পরে ২।৩ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ইনি ৬৬ বর্ষ ৬ মাস বয়ঃক্রমকালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সন্ধ্যা।

এ-সময় মন বিশুদ্ধ-হিয়ায়
ভাব দেখি একবার—
এই যে প্রকৃতি, কে সৃজিল ইহা,
চরাচর বল কার!

সকলি তাঁহার কৃপায় সৃষ্ট
পশু-পক্ষী আদি নর,
সময় থাকিতে ওরে পোড়া মন,
তাঁহারে স্মরণ কর।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আমাদের খাদ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ফল।—টাট্‌কা ফল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—সুগন্ধযুক্ত, স্বাদু এবং সুমিষ্ট পানীয়োপযুক্ত।

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চিনি ফলের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান, অবশিষ্ট আঠাল পদার্থ। এই আঠার জন্যই ইহাতে সহজে মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহার খনিজ উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান্;—ইহা প্রধানতঃ অম্লমিশ্রিত ক্ষার। এই খনিজ পদার্থের প্রধান গুণ শরীরের রক্তকে ক্ষারযুক্ত করা। যে-সকল ফল সুগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পচন-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ফল সিদ্ধ করিলে ইহার আঁস ভাল পরিপাক হয়, কিন্তু ইহার পুষ্টিকর অংশ কিছু নষ্ট হইয়া যায়।

কলা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ফল। আপেলে শতকরা এক অংশ অম্ল। নাশপতিতে শতকরা সাত-অংশ চিনি। কুলে এক অংশ আঠাল পদার্থ। কিস্‌মিসে ৬॥ ভাগ চিনি। বিলাতী বেগুণ অনেক সময় ফল ও সব্‌জী দুয়ের মধ্যেই গণ্য হয়; কারণ,ইহা সিদ্ধ অসিদ্ধ দুই রকমেই আহার করা যায়। পাতি অথবা কাগ্‌জী লেবুতে আঠাল ভাগ কমলা-লেবু অপেক্ষা অধিক।

চা—গাছের শুষ্ক পাতা। চা নানাজাতীয়; তন্মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ ও সিংহলের চা-ই প্রধান। ইহার মধ্যে চীনের চা সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা। ভারতবর্ষের চা অত্যন্ত কড়া এবং এবং সিংহলের চা সুগন্ধবিশিষ্ট। চায়ের প্রধান উপাদান caffeine ও tannic acid. ইহার সুগন্ধ ইহার তৈলীয়-উপাদানের জন্য। ইহাতে caffeine এর ভাগ শতকরা ৪ অংশ ও tannic এর ভাগ ১২ অংশ। উৎকৃষ্ট পানীয় চা প্রস্তুতের তিনটী নিয়ম :—(১) চায়ের জল ঠিক্ ফোটা আবশ্যক; (২) চায়ের আধার (pot) গরম থাকা আবশ্যক; (৩) চা অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখা উচিত নয়। অধিক ক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে tannic acid অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

চা আমাদের খাদ্য নহে। ইহা পরিপাকশক্তির বিঘ্নকারী এবং মাংসের সহিত ইহা কখনও বেশী পরিমাণে পান করা উচিত নয়। ইহার মধ্যস্থ caffeineই উত্তেজক পদার্থ এবং ইহা হৃৎপিণ্ড অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলীরই সবিশেষ অনিষ্ট করে। এই হিসাবে ইহা মদের বিপরীত কার্য্য করে; কারণ, মদের কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপরই অধিক। caffene নিদ্রার বিঘ্নকারী। 'চা' এর অবসাদ-দূরীকরণ গুণের জন্য ইহা স্নায়ু ও পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দৈহিক যন্ত্র-গঠনের উপাদানসমূহের ক্ষয় নিবারণ করে।

কফি।—কফি-গাছের ফলের বীজ আগুনে সেঁকিয়া, চূর্ণ করিয়া, তাহাকে চায়ের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। এক বাটী চা ও এক বাটী কফিতে প্রায় সমান পরিমাণ caffeine ও tannic acid থাকে। সুস্বাদু কফি প্রস্তুত করিতে হইলে, বীজগুলি সদ্যঃ সেঁকিয়া প্রস্তুত করা উচিত। জল ফুটন্ত হওয়া আবশ্যক এবং জলের পরিমাণ কফির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়া দরকার। (এক পাইণ্ট জলে দুই আউন্স কফি উপযুক্ত)।

চায়ের ন্যায় কফিও আমাদের খাদ্য নহে। কফির মধ্যস্থ caffeine ও tannic acid চায়ের ন্যায় শরীরের অনিষ্টকারী। ইহা, কোন কোন খাদ্য যেমন ডিম্ব, মাংস ইত্যাদির পরিপাকে সাহায্য করে।

কোকো।—কোকোও কফির ন্যায় গাছের ফলের বীজ এবং গুণাগুণও ইহার ঐরূপই। ইহাতে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল-পদার্থ কিন্তু চূর্ণ কোকোতে ৩২ ভাগ তৈলীয় পদার্থ থাকে। ইহাতে কিছু tannic ও শ্বেতসারও আছে। কোকোর মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ তৈল ও চিনি প্রত্যেকে প্রায় ২৫ ভাগ ও আঠাল পদার্থ ১২ ভাগ। পুষ্টিকর পদার্থ কোকোতে খুবই অল্প; কারণ, ইহা একেবারে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া কিছুই নাই বলিলেই হয়। বাজারের chocolate (চকোলেট্) এই কোকো হইতে প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাতে কিছু চিনি, কিছু শ্বেতসার ও সুগন্ধ মিশ্রিত থাকে।

চিনি।—চিনি আমাদের একটী প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ইহার খুব সহজেই পরিপাক হয়। চিনি সাধারণতঃ দুই প্রকার :—প্রথমতঃ যাহা ইক্ষু, বীট, খর্জ্জুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, যাহা ফলের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যেও চিনি পাওয়া যায়; কিন্তু উপরিউক্ত দুই প্রকার চিনিই সহজপ্রাপ্য।

আমরা যে চিনি আহার করি, তাহা পাক-স্থলীতে যাইয়া ফলের চিনিতে পরিণত হইয়া তবে পরিপাক হয়। চিনি অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আহার করাই উচিত; কারণ, শুদ্ধ চিনি আহার করিলে পাক-স্থলীতে যাইয়া তাহা গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এবং সে-জন্য চিনি অধিক পরিমাণে খাওয়াও উচিত নহে। কিন্তু দুগ্ধে যে চিনি থাকে, তাহার গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না; সেজন্য ইহা নিরাপদে শিশুকে ও রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য খাদ্যের ন্যায় চিনি দাঁতের পক্ষে অপকারী নয়। ইহা অনেক অংশে শরীরের উত্তাপ-বৃদ্ধি-হিসাবে তৈলীয়-পদার্থের কার্য্য করে।

মধুতে ফলের চিনির ভাগই অধিক এবং যে-ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়, সেই ফুলের গন্ধই ইহাতে পাওয়া যায়।

কিস্‌মিস, খোবানী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শুষ্ক ফলে চিনির অংশ অধিক এবং তাহা অত্যন্ত পুষ্টিকর।

দারিদ্র্য।

ভগ্ন কুটীরের মাঝে বাস কর তুমি
পরিহরি বিলাসের ভোগময়ী ভূমি,
অভাবের নির্য্যাতন সহি' অনিবার,
নিয়ত দমন করি' স্বপ্ন বাসনার,
চিরদিন নৈরাশ্যের দাবানল হেরি',
শুধু অতৃপ্তির হাটে কেনা-বেচা করি',
ভূষণ-বিহনে পরি' কঙ্কালের হার,
স্নেহের বিহনে লভি' ভ্রুকুটি সবার।—
দলিত ফণীর প্রায় মুখ নত করি'
সদা আতঙ্কিত থাক অপমান স্মরি'।
মর্ম্মদাহী তেজ পোষি' অন্তরে হিয়ার
নিরুপায় হ'য়ে সহ ঘৃণার ধিক্কার!
কভু বা সহিতে নারি' দাও ভাসাইয়া;
নিজস্ব সে তেজোময়ি কাঙাল সাজিয়া;
অশান্তি না ঘুচে তায়,—শুধু বাড়ে হায়!
নিষ্করুণ জগতের আরও অবজ্ঞায়!
বাহির জগত-পানে দৃষ্টি-রোধ করি'
আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী রাখ শেষে ধরি';
সেই ক্ষুদ্রতার মাঝে দেখ তুমি চেয়ে
রহে শান্তি—যার লাগি' মরেছে কাঁদিয়ে!
সে অতৃপ্তি—সে অভাব—সেই হা-হুতাশ
নাহি আর! আলোকের অপূর্ব্ব বিকাশ!
পুঞ্জীভূত আলো ধায় উজ্জ্বল প্রভায়
বাহির আঁধার ভেদি' আরও উচ্চতায়,
উঠিতে উঠিতে মিশে অনন্তের সনে!
'হে দারিদ্র্য!' মনে হয় বুঝি সেই ক্ষণে—
ছার ভোগ, ছার হেথা ঐশ্বর্য্য-সম্ভার;
চিরদিন থাক তুমি সকাশে আমার!'

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ইতিহাসে রমণী।

পৃথিবী এক, দেশ শত সহস্র। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি সীমার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যবধানের মধ্যেও দেখা যায়, সকল দেশেই

মানবের মনোভাব এক। জাতি-হিসাবে বর্ণ, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও ভাষায় পার্থক্য থাকে; কিন্তু দয়ামায়া, প্রীতি-ভক্তি, হিংসা-ক্রোধ কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। উত্তর সাগরের হিমতীরবাসী মানব-মানবীর হৃদয় যে ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়, রৌদ্রতপ্ত ভারত-মহাসাগরের তটভূমিতেও সেই ভাবের দূর প্রতিধ্বনি উঠে। বিভিন্ন দেশের রমণী পৃথিবীর ঘটনাচক্রে পড়িয়া কিরূপে আপনাদিগকে দেবী করিয়া তুলে বা কিরূপে দানবী-স্বভাবের পরিচয় দেয়, তাহা সেই সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়।

আমরা যাহাকে বিলাত বলি, সেটি একটি দ্বীপ,—তাহার চারিধারে জল, মধ্যখানে স্থল। এই দ্বীপের উত্তরভাগকে স্কটলণ্ড বলে, দক্ষিণ ভাগকে ইংলণ্ড বলে।

এখন ইংলণ্ড আর স্কটলণ্ড এক রাজার অধীনে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন এই দুইটি দেশ পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ছিল। দুই দেশে দুই জন রাজা; কখন তাঁহাদের সদ্ভাব থাকিত, কখন বা তাঁহাদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে এক বৃদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার এক নিকট আত্মীয় তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। আত্মীয়টিকে একদিন কয়েকটি ডাইনী বলিল যে, তিনি রাজা হইবেন। মনে মনে তাঁহার একটু অস্বস্তি হইল। তাঁহার পত্নী ছিলেন ভয়ানক স্ত্রীলোক। স্বামী রাজা হইলে তিনি রাণী হইবেন, এই আশায় তিনি দিবারাত্র স্বামীকে বলিতেন, "বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হও।" স্ত্রীলোকের প্রাণ স্বভাবতঃ কোমল, রক্তপাতের নাম শুনিলে তাহারা শিহরিয়া উঠে, একটি ফোড়া অস্ত্র হইতে দেখিলে স্ত্রীলোক মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুর দ্বারা গঠিত ছিল। সেনাপতি বীর ছিলেন বটে, তবে তাঁহার মন বড় দুর্ব্বল ছিল, আর তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় ছিল লৌহের মত কঠিন আর ব্যাঘ্রীর মত নিষ্ঠুর। দিনের পর দিন স্ত্রীর উত্তেজনা চলিতে লাগিল। পাথরের উপর ক্ষীণ জলধারা অবিরত পড়িতে থাকিলে পাথরের যেমন ক্ষয় হয়, সেরূপ স্ত্রীর প্ররোচনায় অবশেষে সেনাপতিরও মন টলিল।

বৃদ্ধ রাজা একদিন তাঁহার দুর্গে আসিলেন; সঙ্গে অন্যান্য সামন্তগণ ছিলেন। গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত, সেনাপতি ও তাঁহার স্ত্রী রাজার শয়নাগারের দ্বার-সম্মুখে আসিলেন। সেনাপতির হাতে একটি লম্বা ধারাল ছুরী। তখন দুর্গের বাহিরে ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। রাজার দুই প্রহরী নিদ্রায় অচেতন; কারণ, সেনাপতির স্ত্রী তাহাদের খাদ্যের সহিত ঘুমের ঔষধ মিশাইয়া দিয়াছিলেন। সেনাপতি রাজাকে খুন করিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন,—রক্তমাখা হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী একটুকুও ভয় পান নাই; তিনি স্বামীকে সাহস দিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শে সেনাপতি প্রহরীদিগের অঙ্গে ও বস্ত্রে রক্ত মাখাইয়া দিলেন। রমণী স্বয়ং স্বামীর হস্তের রক্তদাগ ধৌত করিয়া দিলেন এবং তাহার পর দুইজনে শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকালে সকলে দেখিলেন, রাজা খুন হইয়া পড়িয়া আছেন, আর প্রহরী-দুইটি সেই রক্ত মাখা অবস্থায় শয়ান। সেনাপতি অতিশয় রাগের ভাব দেখাইয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিলেন, যেন তাহারাই খুনী। দুই রাজ-পুত্র ভয়ে দেশত্যাগ করিলেন;—জ্যেষ্ঠপুত্র যাইলেন ইংলণ্ডের রাজ-সভায়। রাজ-বংশের আর কেহ না থাকায় সেনাপতিই রাজা হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর মনস্কাম এইরূপে সিদ্ধ হইল।

রাজপদ পাইয়াও সেনাপতি সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী রাণী হইয়া দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন;—তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। একে স্ত্রীর অসুখ, তাহার উপর তাঁহার আরও একটি অশান্তির কারণ ছিল। বৃদ্ধ রাজার এক বিশস্ত সামন্ত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ম্যাক্‌ডফ্। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যথার্থ খুনী কে। বুঝিতে পারিয়াছিলেন অনেকে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার বা করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। ম্যাক্‌ডফ্ একদিন ইংলণ্ডে তাঁহাদের বৃদ্ধ রাজার পুত্রের নিকট পলাইয়া গেলেন। নূতন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে মারিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মনে আশঙ্কা রহিয়া গেল, কোন্ দিন ম্যাক্‌ডফ্ আসিয়া তাঁহার পাপের শাস্তি দেন।

দুষ্ট রাজা যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। যুবরাজ ও ম্যাক্‌ডফ্ ইংলণ্ড হইতে সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যুদ্ধে হত হইলেন।* যুবরাজ এতদিনে পিতার সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার মাথায় ম্যাক্‌ডফ্ রাজ মুকুট পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ ম্যাক্‌ডফের অবিচলিত রাজভক্তির ও স্বার্থ-ত্যাগের পুরস্কার দিলেন। নিয়ম হইয়া গেল, ভবিষ্যতে যখনই কেহ রাজা হইবেন, ম্যাক্‌ডফের বংশধর তাঁহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিবেন। রাজপুতানার মেবার-রাজ্যেও নিয়ম আছে যে, রাণার অভিষেকের সময় একজন ভীল রাজটীকা পরাইয়া দিবে; কারণ, একজন ভীল আপন অঙ্গুলী ছেদন করিয়া মেবার-রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পার ললাটে রক্তটীকা আঁকিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর হইতে বরাবর এই রকমেই রাজার অভিষেক হইয়াছিল। পরে এক সময় আসিল, তখন স্কট্‌লণ্ডের ঘোর দুর্দ্দিন। ইংলণ্ডের রাজা স্কট্‌লণ্ড জয় করিয়া লইলেন। ইংলণ্ডের লোকই স্কট্‌লণ্ড শাসন করিতে লাগিল। এই সময় স্কট্‌লণ্ডের এক সামন্ত ভাবিলেন, তিনি ইংরাজদের তাড়াইয়া দিয়া

* এই দুষ্ট রাজার নাম ম্যাক্‌বেথ। মহাকবি শেক্ষপীয়র-রচিত ম্যাক্‌বেথ-নামে একখানি ইংরাজী নাটক আছে। পরলোকগত বিখ্যাত নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ম্যাক্‌বেথ-নাটকে ম্যাক্‌বেথ ও তাঁহার পত্নীর জীবনের ঘটনাগুলি দেখান হইয়াছে।

জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাক্‌বেথের আখ্যায়িকা লিখিত। প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্‌বেথ দুরাচার ছিলেন না। রাজা হইয়া তিনি সুশাসন ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসনে বৃদ্ধ রাজার অপেক্ষা তাঁহার অধিকার অনেক বেশী ছিল। বৃদ্ধ রাজাকে তিনি নিজ দুর্গে নিহত করেন নাই। বৃদ্ধ-রাজা বিদেশীয় শত্রু-কর্তৃক পরাজিত হইয়া একস্থানে আশ্রয় লইলে ম্যাক্‌বেথ সেইস্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। ম্যাক্‌বেথ-পত্নীর পূর্ব্বপুরুষ স্কটলণ্ডের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধরাজার মাতামহ-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ম্যাক্‌বেথ-পত্নী জাতক্রোধ ছিলেন।

রাজা হইলেন। স্কটলণ্ডের রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। একদিন তিনি আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইঁহার নাম রবার্ট ব্রুস্।

কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক কেমন করিয়া হইবে? দেশের যাঁহারা গণ্যমান্য নেতা, তাঁহারা সকলেই ইংলণ্ডের ভয়ে শশব্যস্ত। কেহ কেহ ইংলণ্ডরাজের অনুগতও ছিলেন। ম্যাক্‌ডফের বংশধরের সাহস হইল না যে, রবার্টের মাথায় মুকুট তুলিয়া দেন। তাঁহার ভগিনী ইসাবেলা কিন্তু ভীত হইলেন না। ম্যাক্‌ডফের বংশে তাঁহার জন্ম, তিনি বংশের মান, রাজার মান ও দেশের মান রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডের দলে ছিলেন। ভ্রাতার অমতে এবং স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই নির্ভীকা রমণী আপন কর্ত্তব্যপালন করিলেন,—গির্জ্জায় গিয়া রবার্টের শিরে মুকুট পরাইয়া দিলেন। *

রবার্ট রাজা হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেরূপ সৈন্যবল ছিল না, ইংরাজ-সৈন্যের নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। তিনি মেবারের রাণা প্রতাপ-সিংহের মত পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন, আর সুযোগ পাইলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন। ইংলণ্ডরাজ তাঁহার শত্রুদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে ধরিতে পারিলেন, তাঁহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। যে সাহসী মহিলা পিতৃকুলের মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারও শাস্তি হইল। ইংলণ্ডের উত্তরে একটি নগরে তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

* য়িহুদী-দুহিতা উপন্যাস-লেখিকা গ্রেস্ অ্যাগুইলার-প্রণীত 'দি ডেজ্, অফ্ ব্রুস্' (ব্রুসের সময়ের কথা)-নামক উপন্যাসে এই রমণীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

এই দুঃসময়ে রবার্টের সহিত কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও সর্ব্বাপেক্ষা বীর ছিলেন ডগ্‌লাস্ নামে এক সেনাপতি। ডগ্‌লাস্ যে শুধু যুদ্ধ করিতে জানিতেন, তাহা নহে, নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাইতেও তিনি জানিতেন। রাজ-সৈন্যের সহিত অনেকগুলি মহিলা ছিলেন। খাদ্যের অভাব হইলে তিনি তাঁহাদের জন্য শিকার করিয়া আনিতেন এবং তাঁহাদের কষ্ট ভুলাইবার জন্য নানারূপ গল্প করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। রাজা রবার্টের নিকট কয়েকখানি গল্পের পুস্তক ছিল,—তিনি অবসর মত সেইগুলি পড়িয়া সকলকে শুনাইতেন।

রাজা রবার্ট অনেক দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন,—কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। একদিন তিনি সঙ্গিহীন অবস্থায় বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া একটি কুটীরে উপস্থিত হ'ন। কুটীরে একটি বৃদ্ধা বাস করিত। বৃদ্ধার সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি বুঝিলেন, তাহার হৃদয় রাজভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধা রাজার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে নিজের দুই পুত্রকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহদিগকে রাজার অনুগামী হইতে বলিল। সে যে ইচ্ছা করিয়া পুত্র-দুইটিকে বিপদের মুখে তুলিয়া দিতেছে, তাহা একবারও ভাবিল না। কি প্রগাঢ় রাজভক্তি! মাতার আদেশে পুত্র-দুইটি নতজানু হইয়া রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা কখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না। শত বিপদের মধ্যেও বীর জননীর বীর পুত্রগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞা ও জননীর আদেশ ভুলে নাই।

কিছুকাল পরে রবার্ট ইংরাজগণকে হারাইয়া দিয়া আবার স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীন রাজা হইলেন। প্রভুভক্ত বীর ডগ্‌লাস্‌ তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে অটল স্তম্ভের মত সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতেন। প্রভুভক্তির জন্য ডগ্‌লাস্‌ বংশ চিরকাল প্রসিদ্ধ ছিল। পরে তাঁহার বংশের দুই-এক জন পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি ভুলিয়া রাজার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু লোকে তাঁহাদের কথা মনে রাখে নাই; মনে রাখিয়াছে সেই প্রথম ডগ্‌লাসের কথা, যিনি রাজার শেষ অনুরোধ রাখিবার জন্য হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।†

রবার্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। স্কট্‌লণ্ডে আবার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। স্কট্‌লণ্ডের প্রাচীন রাজবংশের একজন কুমার ইংলণ্ডের সাহায্যে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন। রবার্টের পুত্রের অধীনে অতিসামান্য অংশই থাকিল—মাত্র চারিটি দুর্গে তাঁহার পতাকা উড়িতেছিল। নূতন রাজা ও তাঁহার ইংরাজ-সৈন্য এই দুর্গ-কয়টি অধিকার করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। দুর্গগুলির মধ্যে দুইটি দুর্গ রমণীর বীরত্বে রক্ষিত হইল। একটি রক্ষা করিলেন রাজা রবার্ট ব্রুসের ভগিনী; আর একটি রক্ষা করিলেন, দুর্গাধিপের বীর পত্নী। ইনি রাজা রবার্টের এক ভগিনীর পৌত্রী। ইঁহার পিতা বীরত্ব ও স্বদেশ-ভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং ইনিও পিতার ঐ গুণ-দুইটি পাইয়াছিলেন।

একজন ইংরাজ সামন্ত এই মহিলার কেল্লা ঘেরাও করেন। তখন কামান-বারুদের প্রচলন হয় নাই, কিন্তু প্রকাণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাচীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইত। যখন ইংরাজ-সেনা এইরূপ পাথরের গোলা ছুড়িত, এই বীর রমণী সখীগণের সহিত আমেদনগরের চাঁদ-সুলতানার ন্যায় দুর্গ-প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং যেখানে ঐ গোলা আসিয়া পড়িত, সেই স্থান একখণ্ড পরিষ্কার বস্ত্রের দ্বারা মুছিয়া দিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ইংরাজগণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, সামান্য ধূলা উড়ান ছাড়া তাহাদের পাথরের গোলা প্রাচীরের আর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং যে-টুকু ধূলা উড়ে, তাহা একখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা অনায়াসে মুছিয়া দিতে পারা যায়।

প্রায় পাঁচ মাস যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ সেনা-পতি কিছু করিতে পারিলেন না। বীর রমণী তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন,—এমন কি তিনি এরূপ কৌশল-জাল পাতিয়াছিলেন যে, আর একটু হইলেই ইংরাজ সেনা-নায়ক বন্দী হইতেন। নূতন সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে ইংরাজ-সৈন্য বিফলমনো-রথ হইয়া চলিয়া গেল।

দুর্গগুলি রক্ষা হইল। ফলে স্বদেশভক্ত সৈন্যগণের সাহস বাড়িয়া গেল। রবার্টের পুত্র পুনরায় সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন।

† রবার্টের ইচ্ছা ছিল, পুণ্যতীর্থ জেরুজালেম দর্শন করেন। সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়া যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, তখন বন্ধু ডগ্‌লাস্‌কে অনুরোধ করেন, যেন তিনি রাজার হৃৎপিণ্ড জেরুজালেমে লইয়া যান। রবার্টের মৃত্যুর পর ডগ্‌লাস তাঁহার হৃৎপিণ্ড একটি আধারে লইয়া কয়েক শত সঙ্গীর সহিত যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে একস্থানে যুদ্ধে নিহত হ'ন। যখন তাঁহার মৃতদেহ বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তিনি সেই আধারটি বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া আছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্টের দৌহিত্র-বংশ রাজত্ব করেন।

বর্তমান সময়ের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ডে আবার গোলযোগ ঘটিল। তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি রাজ-কার্য্য কিছুই দেখিতেন না। তাঁহার ভাই-ই সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। ভাইয়ের ইচ্ছা, তিনি আপনি রাজা হ'ন। দিন-রাত্ তিনি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ খুড়ার হস্তে বন্দী হইলেন। একটি কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। জল বা খাদ্য কিছুই তাঁহাকে দেওয়া হইত না। উদ্দেশ্য, তাঁহাকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলা। যুবরাজের কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া একটি স্ত্রীলোকের মনে দয়া হইল। সে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ ছিল দেবীর মত। সে বস্ত্রের মধ্যে খুব পাত্‌লা বার্লির রুটি করিয়া লুকাইয়া আনিত এবং কারাগারের জানালার গরাদের ভিতর দিয়া ফেলিয়া দিত। পান করিবার জন্য জল আনিবার সুবিধা হইত না। আর একটি স্ত্রীলোক জানালার গরাদের ফাঁকে আপনার স্তন প্রবেশ করাইয়া দিত, হতভাগ্য যুবরাজ সেই দুগ্ধ পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতেন।

রমণী-দুইজনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাজপুত্রের প্রাণ-রক্ষা হইল না। প্রহরীরা সমুদায় ব্যাপার জানিতে পারিয়া রমণীদের আসা বন্ধ করিয়া দিল। যুবরাজ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন।*

রাজা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিলেন, তখন তিনি কনিষ্ঠপুত্রের জন্য ভাবিয়া আকুল হই[illegible]লন। কনিষ্ঠ রাজপুত্র তখন বালকমাত্র। তাঁ[illegible]াকে একটা জাহাজে তুলিয়া ফরাসী-দেশে পা[illegible]াইয়া দেওয়া হইল, পাছে শত্রু তাঁহাকেও মারিয়া ফেলে। সে-জাহাজ ফরাসী-দেশে পৌঁছায় নাই। মধ্য-পথে একখানি ইংরাজ-জাহাজ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তখন ইংলণ্ডের সহিত স্কট্‌লণ্ডের সদ্ভাব ছিল না। ইংলণ্ডের রাজার আদেশে যুবরাজ একটি দুর্গে বন্দী থাকিলেন। ইনি পরে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হ'ন। তখন ইঁহার নাম হইয়াছিল প্রথম জেমস্।

রাজপুত্র বন্দী রহিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন দুর্ব্ব্যবহার করা হইল না। তাঁহার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই শিক্ষার ফলে তিনি একজন সুকবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় উনিশ বৎসর তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। একদিন তিনি দুর্গের জানালা হইতে দেখিলেন, নীচে বাগানে একটি রমণী ভ্রমণ করিতেছেন। † তাঁহার ভাবী পত্নীকে তিনি এই প্রথম দেখিলেন। সে রমণীর নাম জেন, ইংলণ্ডের তিনি রাজার আত্মীয়া। তাঁহাদের বিবাহের পরে যুবরাজ পত্নী জেনের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সকলে ভাবিল, এইবার দুইজাতির মধ্যে সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইবে।

---

* সুপ্রসিদ্ধ স্কট্‌লণ্ড-দেশীয় ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার স্কট-প্রণীত 'ফেয়ার্ মেড্ অব পার্থ' (পার্থ-নগরের সুন্দরী কুমারী)-নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুবরাজের মৃত্যুর লোমহর্ষণ কাণ্ড বর্ণিত আছে।

† জেমস্ আপনার প্রণীত 'কিংস্ কোয়ের' (রাজার পুস্তক) এ তাঁহার প্রণয়-কাহিনী সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

স্কট্‌লণ্ডে তখন ঘোর অরাজকতা। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছিল। সবল দুর্ব্বলের উপর অবাধে অত্যাচার করিয়া যাইতেছিল। স্বার্থপর সামন্তের দল এ-বিষয়ে প্রধান অপরাধী। রাজা হইয়া জেম্‌সের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, দেশে শান্তি-স্থাপন করা। তিনি সামন্তগণকে দমন করিবার চেষ্টা পাইলেন, ফলে, অনেক সামন্ত তাঁহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন।

মানবের শোণিত-পিপাসা কখনও নিবৃত্ত হয় না। রক্ত-লোলুপ পশুর ন্যায় সে হত্যার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই সময় রক্ত-পাতের যুগ। কার্য্য যতই ঘৃণিত, যতই নিষ্ঠুর হউক্ না কেন, মানব কিছুতেই পশ্চাৎপদ্ হইত না। পৃথিবীর এই অন্ধকার যুগে কতিপয় রমণীর মহত্ত্ব নৈশ-গগনে শুক-তারার ন্যায় জল্ জল্ করিতেছে। দুইজন সামান্য স্ত্রীলোক জেম্‌সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ইতিহাস তাহাদের সে-চেষ্টার কথা ভুলে নাই। প্রদীপ-শিখার নিম্নেই অন্ধকারের পুঞ্জ। হিংস্র মানবচিত্তের নিকটে থাকিয়া সে স্বর্গীয় দৃশ্য তাহাকে আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডে যে পৈশাচিক হত্যার অভিনয় হইল, তাহার মধ্যেও নারী আপনার মহিমায় আপনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর হত্যাকারী দানবদলের পাপ-কালিমা আরও গাঢ়তর হইয়া রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-সমালোচনা।

অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ।—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও ১৪ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।—

গ্রন্থকার তাঁহার অতীত জীবনে ব্রাহ্ম-সমাজে যাহা যাহা দেখিয়াছেন্, তাহাই তাঁহার এই বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত জরাজীর্ণদেহে অতীব সরল ও সুললিত ভাষায় এই গ্রন্থে বিংশতি অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন্। আদর্শ স্বার্থত্যাগী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের সম্মিলনে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ এতদ্দেশে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শক্তিসম্পন্ন হইল এবং বর্ত্তমান সময়ে কিজন্যই বা ইহা ইহার তাদৃশ-আকর্ষণী-শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে, তাহা তিনি কতিপয় প্রাচীন ধর্ম্মাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-বিবৃতি ও নিজ অভিজ্ঞানলব্ধ উপলব্ধি দ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন্। তাঁহার পুস্তক পাঠে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্কীর্ণগণ্ডী তিরোহিত হইয়া যায় এবং তদানীন্তন ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের জীবনালেখ্য হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন্, তাহার আদর্শ ফুটিয়া উঠে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত গভীর ভক্তিসহকারে লিখিত এবং পরমহংসদেব, ব্রহ্মা-নন্দ, ৺উমেশচন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণের অজ্ঞাত বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার যে প্রতিকৃতিগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানিই অতিশয় মূল্যবান্ ও আদরের সামগ্রী। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী নিজ নিজ জীবনের আদর্শের সহিত প্রাচীন আদর্শের তুলনা করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবেন্ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের উদ্যম, বিলাসবিদ্বেষ, নিঃস্বার্থতা ও সফলতা নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন্; এবং জাতীয় জীবনের এই নব জাগরণের দিনে, সত্যানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া, দেশবাসী হৃদয়ে বল লাভ করিবেন্। পুস্তকের মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মূল্য ১৲ (এক টাকা মাত্র)।